লেকচার লাহোর

ইসলাম ও এদেশের অন্যান্য ধর্মমত

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

محمد است امام و چراغ ہر دو جہاں — محمد است فروزندہ زمین و زماں
خدا نگویمش از ترس حق مگر بخدا — خدا نماست وجودش برائے عالمیاں

মুহাম্মদ (সা.) দু'জাহানের নেতা ও সূর্য
মুহাম্মদ (সা.) জগতের ও যুগের সদা জীবন্ত সত্তা
খোদার ভয়ে তাঁকে আমি খোদা বলি না
কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম জগদ্বাসীর জন্য
তাঁর সত্তা খোদার দর্পণস্বরূপ॥

[ফার্সী পংক্তির বঙ্গানুবাদ]

লেকচার লাহোর

(ইসলাম ও এদেশের অন্যান্য ধর্মমত)

যুগ-ইমাম ও মুজাদ্দেদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর
৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ ইং তারিখে
লাহোরে এক বিরাট জনসমাবেশে পঠিত ভাষণ

লেকচার লাহোর

(ইসলাম ও এদেশের অন্যান্য ধর্মমত)

গ্রন্থস্বত্ত্ব	**ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ.কে.**
প্রকাশক	**আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ** ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মূল	**হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী** প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)
ভাষান্তর	**মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী** মুরব্বী সিলসিলাহ্
১ম প্রকাশ	জুন ২০০০
৩য় প্রকাশ	মে ২০২৩
সংখ্যা	২০০০ কপি
মুদ্রণ	ইন্টারকন এসোসিয়েটস ৪৫/এ, নিউ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Lecture Lahore

লেকচার লাহোর
(ইসলাম ও
এদেশের অন্যান্য ধর্মমত)

by **Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian**
Promised Messiah & Imam Mahdi[as]

Translated into Bengali
Maulana Abdul Awwal Khan Chowdhury
Murabbi Silsilah

1st Published in Bangladesh in June, 2000

3rd Published in Bangladesh in May 2023

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

© **Islam International Publication Ltd. U.K.**

ISBN: **978-984-991-039-8**

বিষয় নির্দেশিকা ঃ

* পাপের আধিক্যের মূল কারণ ও এর প্রতিকার ঃ ৯, ১২
* ইসলামের প্রকৃত অর্থ ও দর্শন ঃ ১৩, ২৪
* আল্লাহ্ তা'লার চিরস্থায়ী মোহনীয় গুণাবলী ঃ ১৪, ১৬, ১৭
* ইসলাম ধর্মে আচরণ বা কর্মের তিনটি স্তর ঃ ১৭, ১৮, ১৯
* 'কাফুর', 'যান্‌জাবীল' ও 'সাল্‌সাবীল' এর ব্যাখ্যা ঃ ২১, ২২
* ইসলাম ধর্মে পূর্ণ মারেফাত লাভের পথ খোলা ঃ ২৪, ২৫, ২৬
* 'পরিত্রাণ' বা নাজাতের বিষয়ে খ্রিষ্টীয় শিক্ষার অসারতা ঃ ২৭, ২৮
* যীশু খ্রিষ্টের ইশ্বরত্ব ও ত্রিত্ববাদের খণ্ডন ঃ ২৯
* ইসলামী শিক্ষা ও খ্রিষ্টীয় শিক্ষার তুলনা ঃ ৩০, ৩১
* আর্য ধর্মের শিক্ষা পরিত্রাণ দানে অক্ষম ঃ ৩২, ৩৩, ৩৪
* ইসলামী শিক্ষানুযায়ী জাহান্নাম অনন্ত চিরস্থায়ী শাস্তির জন্য নয় ঃ ৩৫
* 'জন্মান্তরবাদ' বা 'পুনর্জন্মবাদের' অসারতা ঃ ৩৫,৩৬, ৩৭
* এ যুগে পর্দা প্রথার আবশ্যকতা ঃ ৩৭, ৩৮
* শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের নির্ধারিত সময় ঃ ৪২
* শেষ যুগের কয়েকটি আলামত ঃ ৪৭
* মানব সভ্যতার এক একটি চক্র সাত হাজার বছরের ঃ ৪৮, ৪৯
* আগমনকারী 'ইবনে মরিয়ম' হবেন কোন্ অর্থে ঃ ৫০, ৫১
* হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ঃ ৫৬, ৫৭
* প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিকে যাচাই করার পন্থা ঃ ৫৮, ৫৯
* সতর্কবাণী (ওয়াঈদ) সংক্রান্ত স্থায়ী নীতি ঃ ৬০
* 'যুলকারনাইন' সংক্রান্ত আয়াতের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা ঃ ৬২, ৬৩, ৬৪

দু'টি কথা

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর আনুগত্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ হবার আধ্যাত্মিক মর্যাদা লাভ করেন। তাঁর বক্তব্য ও লেখা পবিত্র কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যাস্বরূপ। বাংলাদেশে এ যাবৎ তাঁর যতগুলো পুস্তক অনূদিত হয়েছে তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতূল। আমাদের জামা'তের আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তাঁর পুস্তকাদি ক্রমান্বয়ে অনুবাদ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে আমরা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর লাহোরে পঠিত এক বক্তৃতা **'ইসলাম আওর ইস মূলক কে দূসরে মাযাহেব'** পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ **'ইসলাম ও এদেশের অন্যান্য ধর্মমত'** নামে প্রকাশ করার সৌভাগ্য লাভ করছি। এই বইটি অনুবাদ করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। আল্লাহ্ তা'লা তার এই সেবা কবুল করুন (আমীন)।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর জীবনের শেষাংশে যেসব বই-পুস্তক রচনা করেছেন সেগুলো সহজ ভাষায় রচিত। অল্প কথায় তিনি যে কত গভীর ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদির অবতারণা করেছেন এই পুস্তিকা পাঠ করলে পাঠকরা তা সহজেই অনুধাবন করবেন। এই অনুবাদ প্রকাশ করার জন্য যারা যেভাবে পরিশ্রম ও সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'লা উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন (আমীন)।

ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

তারিখ: ৮ জুন ২০০০

পুস্তক পরিচিতি

লেকচার লাহোর (ইসলাম ও এদেশের অন্যান্য ধর্মমত)

এটা হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর একটি বক্তৃতা যা ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯০৪ইং সনে লাহোরে একটি বিরাট জনসমাবেশে পাঠ করা হয়। এটি 'লেকচার লাহোর' নামেও প্রসিদ্ধ। এই বক্তৃতায় হুযুর (আ.) ইসলাম, হিন্দু ধর্মমত ও খ্রিষ্ট ধর্মমতের বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং যুক্তিসহকারে ইসলামের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন।

হুযুর (আ.) বলেন, বর্তমান যুগে পাপের আধিক্যের প্রকৃত কারণ মারেফাতে ইলাহী তথা পূর্ণ ঐশী জ্ঞানের অভাব। এই রোগের চিকিৎসা খ্রিষ্টানদের প্রচারিত ত্রিত্ববাদ দ্বারাও সম্ভব নয় আর হিন্দুদের বেদ প্রদত্ত শিক্ষাও এর সমাধান দিতে পারে না। পূর্ণ মারেফাত সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'লার সাথে কথোপকথন ও বাক্যালাপের মাধ্যমে অর্জিত হয়। আর এই নিয়ামত ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মমতে পাওয়া যায় না। কেননা, খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের মতে ওহী বা ঐশী বাণী লাভের পথ চিরতরে রুদ্ধ।

ধর্মের প্রধান দিক দু'টি। একটি হলো 'বিশ্বাস' অপরটি হলো 'আমল' বা কর্ম। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয় হলো আল্লাহ্ তা'লার সত্তা ও তাঁর গুণাবলীর বিষয়ে বিশ্বাস। হুযুর (আ.) আল্লাহ্র ঐশী গুণাবলীর বিষয়ে ইসলামের পূর্ণ শিক্ষা উপস্থাপন করে খ্রিষ্টানদের পরিবেশিত ত্রিত্ববাদের আর হিন্দুদের বেদ পরিবেশিত আত্মা ও অণু-পরমাণুর অনাদি হবার বিশ্বাসকে অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেন।

আমাদের দিক থেকে ইসলাম ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাও তিনি তাঁর বক্তব্যে উপস্থাপন করেন এবং আচরণের ক্ষেত্রে ন্যায়-প্রতিষ্ঠা, অনুগ্রহ-প্রদর্শন ও সৃষ্টির প্রতি আত্মীয়সুলভ আচরণ– এই তিন স্তরে বিন্যস্ত ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য তুলে ধরেন। এই চমৎকার ও পরিপূর্ণ শিক্ষা অন্য কোন ধর্মমতে পাওয়া যায় না। ক্ষমা ও প্রতিশোধ প্রমাণের বিষয়ে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) তাঁর এই বক্তব্যে ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের শিক্ষার তুলামূলক আলোচনা করে খ্রিষ্টীয় শিক্ষার অসারতা প্রমাণ করেন। একই সাথে তিনি মুক্তির মাধ্যমে আর্য সমাজী হিন্দুদের 'পুনর্জন্মবাদ'-এর বিশ্বাস ও 'নিয়োগ' প্রথার অযৌক্তিকতা সাব্যস্ত করেন।

বক্তব্যের শেষের দিকে হুযুর (আ.) তাঁর নিজ সত্যতার প্রমাণাদি দলিল ও যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করেছেন।

[রূহানী খাযায়েন ২০তম খণ্ডে প্রদত্ত পরিচিতি।]

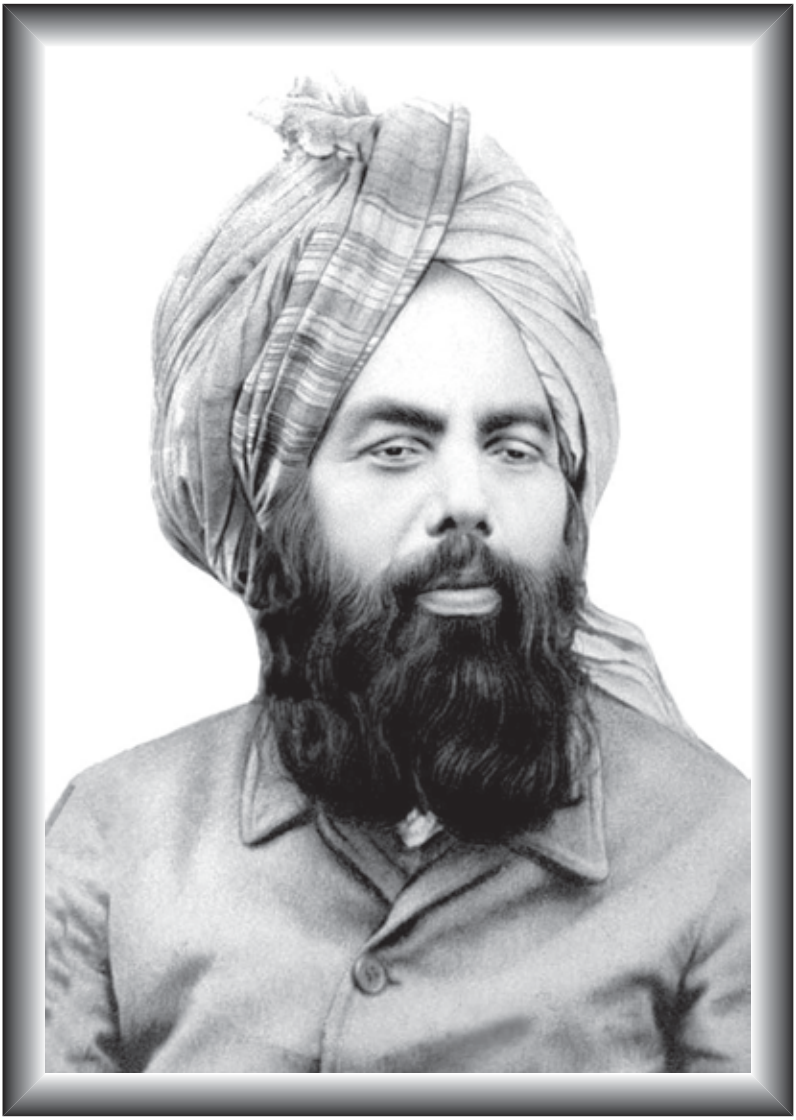

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)
[জন্ম: ১২৫০ হি: ১৮৩৫ খ্রি: মৃত্যু: ১৩২৬ হি: ১৯০৮ খ্রি:]

আজকে আমি ২৭ আগষ্ট, ১৯০৪ তারিখের 'পয়সা' পত্রিকা পড়ে জানতে পারলাম হাকিম মির্যা মাহমুদ নামক একজন ইরানী ব্যক্তি লাহোরে অবস্থান করছেন। তিনি মসীহ্ হবার কথিত এক দাবিদারের সমর্থক বলে পরিচয় দেন এবং আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা পোষণ করেন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, সময়ের অভাবে আমি তার এই আবেদনটি গ্রহণ করতে পারছি না। কারণ, আগামীকাল শনিবার জলসায় আমি ব্যস্ত থাকব। রোববার ভোরে আমাকে আদালতে দায়েরকৃত একটি মামলার কারণে গুরুদাসপুরে যেতে হবে। আমি প্রায় বারো দিন যাবৎ লাহোরে অবস্থান করছি। এ সময়ের মধ্যে কেউ আমার কাছে এ ধরনের আবেদন করেন নি। এখন আমার যাবার মুহূর্তে অন্য কাজে ব্যয় করার মত এক মিনিট সময়ও আমার হাতে নেই। এমন সময়ে এই আবেদন করার হেতু ও উদ্দেশ্য আমার বোধগম্য নয়। তথাপি আমি হাকিম মির্যা মাহমুদ সাহেবকে মীমাংসার আর একটি পরিষ্কার উপায় বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে, আগামীকাল ৩ সেপ্টেম্বর জনসমাবেশে আমার বক্তৃতা পাঠ করা হবে। বক্তৃতাটি 'পয়সা' পত্রিকার সম্পাদক সাহেব যেন তাঁর পত্রিকায় পূর্ণাকারে ছাপিয়ে দেন। হাকিম সাহেবের নিকট আবেদন, তিনিও যেন আমার বক্তৃতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁর নিজের রচনাটি প্রকাশ করেন। দু'টি প্রবন্ধ পড়ে পাঠকবৃন্দ নিজেরাই মীমাংসা করতে পারবেন, কার প্রবন্ধ সততা, খোদাভীতি ও শক্তিশালী যুক্তি সংবলিত এবং কোন্‌টি এথেকে বঞ্চিত। আমার মতে, মীমাংসার এই পদ্ধতি ঐ সমস্ত কুফল থেকে মুক্ত থাকবে যা আজকাল অধিকাংশ যুক্তিতর্কের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এ প্রবন্ধে হাকিম সাহেবকে সম্বোধন করা হয় নি এবং তাঁর কোন উল্লেখও নেই। তাই এটা সব ধরনের মনোমালিন্যের ঊর্ধ্বে থাকবে, তর্ক-বিতর্কে কখনো কখনো যার আশঙ্কা দেখা দেয়।

ওয়াস্‌সালাম

লেখক– মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

প্রথমে আমি খোদার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কেননা তিনি এমন একটি শান্তিপ্রিয় সরকারের ছত্রছায়ায় আমাদেরকে স্থান দিয়েছেন যা আমাদেরকে ধর্মীয় প্রচারণায় বাধা প্রদান করে না আর ন্যায় ও সুবিচার দ্বারা সব ধরনের বাধা-বিপত্তি আমাদের পথ থেকে অপসারণ করে। সুতরাং আমরা খোদাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার পর এ সরকারকেও ধন্যবাদ জানাই।

সম্মানিত শ্রোতৃবর্গ! এর পর আমি এদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন ধর্মমত সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী ভদ্রতা বজায় রেখে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করবো। তথাপি আমি জানি কিছু সংখ্যক লোকের কাছে নিজ ধর্ম ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সত্য কথা শোনাটাও স্বভাবতঃ অসহনীয়। এই স্বভাবজাত ঘৃণা দূর করা আমার সাধ্যাতীত। যাই হোক, আমি সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রেও সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী! আমি গভীর চিন্তা-ভাবনা এবং একাধারে অবতীর্ণ খোদা তা'লার ঐশীবাণীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি, যদিও এ দেশে নানা ধরনের অনেক ধর্মগোষ্ঠী আর অনেক ধর্মীয় বিরোধ বিদ্যমান এবং ধর্মীয় বিরোধ এক প্লাবনের মত ছড়িয়ে পড়েছে তথাপি এই মতবিরোধের আধিক্যের কারণ মূলতঃ একটিই। এবং তা হলো, বেশিরভাগ মানুষের মনে আধ্যাত্মিকতা এবং খোদা-ভীতি হ্রাস পেয়েছে। সেই অলৌকিক জ্যোতিঃ যার মাধ্যমে মানুষ সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম তা অনেকের মন থেকে নিঃশেষ হয়ে চলেছে আর পৃথিবী এক ধরনের নাস্তিকতায় ছেয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ মুখে আল্লাহ্ আর পরমেশ্বরের নাম যপা হয় ঠিকই কিন্তু অন্তরে নাস্তিকতার ধ্যান-ধারণা বৃদ্ধি লাভ করছে। এর প্রমাণ হলো, মানুষের ব্যবহারিক আচরণ যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটি নয়। নীতি-আদর্শের কথা সব মুখে মুখে, বাস্তব আচরণে সেগুলোকে অবলম্বন

করা হয় না। দৃষ্টির অগোচরে যদি কেউ পুণ্যবান থেকে থাকেন, তাঁর বিরোধিতা আমার উদ্দেশ্য নয়– কিন্তু সমাজের বাহ্যিক অবস্থা এটাই প্রমাণ করে, মানুষের জন্য যে উদ্দেশ্যে ধর্মকে অপরিহার্য করা হয়েছে তা আজ বিলুপ্ত। হৃদয়ের সেই পবিত্রতা, খোদার প্রকৃত প্রেম, তাঁর সৃষ্টির প্রতি খাঁটি সহানুভূতি, নির্মলতা, দয়া, সুবিচার, বিনয়, উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী, খোদা-ভীতি, পবিত্রতা এবং সততা– এসবের প্রতি অধিকাংশ মানুষ উদাসীন। পরিতাপের বিষয়, পৃথিবীতে দিন দিন ধর্মীয় হানাহানি বাড়ছে ঠিকই কিন্তু আধ্যাত্মিকতা ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে। ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, বিশ্বজগতের স্রষ্টা সেই প্রকৃত খোদার পরিচয় লাভ করা এবং তার ভালোবাসায় এমন এক স্তরে উন্নীত হওয়া যা অন্য সব কিছুর মোহকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে আর তাঁর সৃষ্টির প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি প্রকাশ ও নিজে প্রকৃত পবিত্রতা অবলম্বন। কিন্তু আমি দেখছি, এ যুগে এই উদ্দেশ্যটির প্রতি কারও ভ্রুক্ষেপ নেই। বেশিরভাগ মানুষ নাস্তিকতার কোন না কোন শাখাকে অবলম্বন করে আছে আর আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের পরিচয় দুর্লভ হয়ে গেছে। এ কারণে পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত পাপের দুঃসাহস বাড়ছে। একথা অতি স্পষ্ট, মানুষ যে জিনিষের পরিচয় জানে না তার প্রকৃত মূল্যায়ন করা কিংবা হৃদয়ে তার প্রতি ভালোবাসা জন্মানো সম্ভব নয় আর তাঁর প্রতি ভীতিও সঞ্চারিত হয় না। যাবতীয় ভীতি, ভালোবাসা ও মূল্যায়ন একটি জিনিসের পরিচয় লাভের পরই সৃষ্টি হয়। সুতরাং একথা পরিষ্কার, বর্তমানে জগতে খোদা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান বা 'মারেফাত'- এর অভাবই পাপের আধিক্যের কারণ।

সত্য ধর্মের লক্ষণসমূহের মধ্যে একটি মহান লক্ষণ হলো, খোদা তা'লাকে জানার ও চেনার অনেক উপকরণ যেন এর মাঝে বিদ্যমান থাকে যাতে মানুষ পাপ থেকে বিরত থাকতে পারে এবং খোদার রূপ-সৌন্দর্যের সন্ধান লাভ করে তাঁর পূর্ণ ভালোবাসায় এবং প্রেমে আবদ্ধ হয় আর সে এই ঐশী সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্নতাকে যেন নরক-যন্ত্রণার চেয়ে বেশি গুরুতর মনে করে। এ কথা সত্য, পাপ থেকে বিরত থাকা এবং খোদার ভালোবাসায় আপ্লুত হওয়া মানব জীবনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য। এই সেই প্রকৃত শান্তি যাকে আমরা স্বর্গীয় জীবন বলে আখ্যায়িত করতে পারি। খোদার সন্তুষ্টির প্রতিকূল সমস্ত কামনা-বাসনা নরকের আগুনস্বরূপ আর এ সমস্ত বাসনা অনুসরণে জীবন অতিবাহিত করাই নারকীয় জীবন। কিন্তু

এস্থলে প্রশ্ন হলো, এই নারকীয় জীবন থেকে নিস্কৃতি লাভের উপায় কি? খোদা তা'লা এর উত্তরে যে জ্ঞান আমাকে দান করেছেন তদনুযায়ী, এই অগ্নি-নিবাস থেকে নিস্কৃতি খোদার সম্যক ও পূর্ণ জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল। কেননা, মানুষকে নিজের প্রতি আকর্ষণকারী এই কুপ্রবৃত্তি এক প্রবল বন্যার ন্যায় ঈমানকে ধ্বংস করার জন্য অবিরাম গতিতে বয়ে চলেছে। এক তীব্রতার প্রতিকার কেবল আরেক তীব্রতা দ্বারাই করা সম্ভব। এ কারণেই মুক্তির জন্য পূর্ণ মারেফাত (পূর্ণ ঐশী জ্ঞান) অপরিহার্য। কথায় বলে, লোহা দিয়েই লোহা কাটতে হয়। কোন জিনিষের সঠিক মূল্যায়ন, ভালোবাসা এবং ভীতি যে সেই বিষয়ে পূর্ণ-জ্ঞান থেকেই সৃষ্টি হয়– এ ব্যাপারে বেশি যুক্তি প্রদর্শন নিস্প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, কোন শিশুকে যদি কয়েক কোটি টাকা মূল্যের একখণ্ড হীরক দেয়া হয় তবে তার দৃষ্টিতে সেই হীরক খণ্ডের মূল্য নিছক একটি খেলনার মতই হবে। অথবা কোন ব্যক্তিকে যদি তার অজ্ঞাতসারে বিষ মেশানো মধু দেয়া হয় তবে সে সেটি সানন্দে গ্রহণ করবে- এতে যে তার মৃত্যু নিহিত আছে তা সে বুঝবে না। কেননা, সেই বিষ সম্বন্ধে সে মোটেও অবগত নয়। কিন্তু জেনে শুনে তোমরা সাপের গর্তে হাত দিতে পারো না। কেননা, তোমরা জানো এ কাজে মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে। অনুরূপভাবে জ্ঞানতঃ তোমরা একটা মারাত্মক বিষ খেতে পারো না। কারণ, তোমরা নিশ্চিতভাবে জানো এই বিষ খেলে তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। তবে কেন তোমরা সেই মৃত্যুর জন্য মোটেও চিন্তিত নও যা খোদার আদেশ অমান্য করায় নিহিত? বলা বাহুল্য, এই পাপের হেতু হলো, এস্থলে তোমরা খোদা সম্বন্ধে এতখানি জ্ঞানও রাখো না, যতটা তোমরা সাপ আর বিষ সম্বন্ধে রাখো। এটা নিশ্চিত বিষয় এবং কোন যুক্তি একথা খণ্ডন করতে পারবে না, নিশ্চিত জ্ঞানই মানুষকে তার জীবন এবং সম্পদের জন্য ক্ষতিকর সমস্ত জিনিষ থেকে বিরত রাখে। এবং এ ধরনের আত্মসংযমের জন্য মানুষ কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তবাদের মুখাপেক্ষী নয়। এটা কি সত্য নয় যে, অপরাধে অভ্যস্ত সন্ত্রাসী লোকেরাও হাতে নাতে ধরা পড়ার ভয়ে এবং ভয়ানক শাস্তিকে নিশ্চিত জেনে কুপ্রবৃত্তির অনেক তাড়না ও লালসা ত্যাগ করে থাকে? তারা প্রকাশ্য দিবালোকে হাজার হাজার টাকা উন্মুক্ত পড়ে থাকা এমন দোকানে আক্রমণ করতে পারে না যেগুলোর পথে বহু সশস্ত্র পুলিশ টহলরত। চুরি অথবা ছিনতাই থেকে এরা কি কোন 'প্রায়শ্চিত্তবাদের' কারণে কিংবা কোন ক্রুশীয়

বিশ্বাসের প্রভাবে বিরত থাকে? কখনই না। বরং তাদের এই সংযমের একমাত্র কারণে হলো, তারা পুলিশের কালো পরিচ্ছদটি ভালোভাবে চেনে এবং এদের তরবারির ঔজ্জ্বল্য তাদের বুকে ভয়ের সঞ্চার করে এবং তারা নিশ্চিতভাবে জানে, অবৈধ কর্মের ফলে তাদেরকে বেঁধে তৎক্ষণাৎ কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে। এ নিয়ম শুধূ মানুষের বেলায় নয় বরং জীবজন্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অগ্নিকুণ্ডলীর অপর প্রান্তে একটি শিকার থাকলেও আক্রমণের জন্য প্রস্তুত একটি বাঘ কখনো শিকারের আশায় জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। নেকড়ে এমন কোন ছাগলের উপর আক্রমণ করে না যার কাছে তার মালিক গুলিভরা বন্দুক আর নগ্ন তরবারি হাতে দণ্ডায়মান ও প্রস্তুত। সুতরাং হে আমার প্রিয়গণ! এটা অতীব সত্য এবং পরীক্ষিত দর্শন, পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য 'প্রায়শ্চিত্তে'র নয় বরং মানুষ খোদার 'পূর্ণ জ্ঞানের' মুখাপেক্ষী। আমি সত্যি সত্যিই বলছি, যদি নূহের জাতি সেই পূর্ণ খোদাভীতি সৃষ্টিকারী মারেফাত লাভ করতো তবে সে জাতি কখনো ডুবতো না। আর লূতের জাতিকে যদি সেই সত্যিকার 'পরিচয়' দান করা হতো তবে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষিত হতো না। আর যদি এই দেশকে খোদা তা'লা সম্বন্ধে মানবদেহে ভীতির শিহরণ সৃষ্টিকারী সেই 'পূর্ণ-জ্ঞান ও পরিচয়' প্রদান করা হতো তবে এদেশে সমাগত প্লেগের সেই মারাত্মক মহামারি দেখা দিত না। কিন্তু অসম্পূর্ণ মারেফাতে কোন লাভ নেই এবং এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট ভালোবাসা ও ভীতিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। যে ঈমান অসম্পূর্ণ তা নিরর্থক, যে ঐশী-প্রেম অপূর্ণ তা নিষ্ফল, যে খোদা-ভীতি অপূর্ণ তা বৃথা, যে 'মারেফাত পূর্ণ নয় তা বৃথা, এমন খাদ্য ও পানীয় যা পর্যাপ্ত নয় তা নিষ্ফল। ক্ষুধার বেলায় একটি শস্য দানা খেয়ে তোমরা কি ক্ষুধা নিবারণ করতে পারো? পিপাসিত হলে এক বিন্দু পানি দ্বারা তোমরা কি পিপাসা দূর করতে পারো? সুতরাং হে দুর্বলচিত্ত এবং সত্যান্বেষণে অলস মানুষ! অসম্পূর্ণ জ্ঞান, স্বল্প-প্রেম এবং স্বল্প-ভীতি দ্বারা তোমরা কীভাবে খোদার বৃহত্তর কৃপা লাভের প্রত্যাশী হতে পারো? পাপ দূরীকরণ খোদার কাজ এবং মনকে স্বীয় ভালোবাসায় মগ্ন করাও সেই সর্বশক্তিমান ও শক্তিশালী সত্তার কাজ এবং কারও মনে তাঁর ভীতি ও ভক্তি সৃষ্টি হওয়া তাঁরই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আদিকাল থেকে এটাই চিরন্তন নিয়ম। এ সবকিছু পূর্ণ মারেফাত অর্জন করার পর অর্পিত হয়। ভীতি, ভালোবাসা এবং সঠিক মূল্যায়ণের ভিত্তি পূর্ণ মারেফাতে নিহিত। যাকে পূর্ণ

মারেফাত অর্পণ করা হয় তাকে ভীতি-ভালোবাসাও পরিপূর্ণরূপে দান করা হয় এবং যাকে পূর্ণাঙ্গ ভীতি ও ভালোাবাসা দেয়া হয় তাকে ঔদ্ধত্য প্রসূতঃ প্রত্যেক পাপ থেকেও মুক্তি দান করা হয়। সুতরাং এই মুক্তিলাভের জন্য আমরা কোন রক্ত প্রদানেরও মুখাপেক্ষী নই, আমাদের কোন ক্রুশেরও প্রয়োজন নেই আর আমাদের কোন প্রকার 'প্রায়শ্চিত্তের'ও দরকার নেই। বরং আমাদের কেবল একটিই ত্যাগের প্রয়োজন এবং সেটি হচ্ছে নিজ সত্তার কুরবানী। মানব স্বভাব এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ ধরণের ত্যাগেরই আরেক নাম 'ইসলাম'। ইসলামের অর্থ জবাই-এর উদ্দেশ্য গর্দান পেতে দেয়া। অর্থাৎ, পূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে নিজের আত্মাকে খোদার কাছে সমর্পণ করা। এই সুন্দর নামটি সমস্ত ধর্মের প্রাণ এবং যাবতীয় বিধানের মুলকথা। আন্তরিকতাসহ স্বেচ্ছায় জবাই হবার জন্য প্রস্তুত হতে পূর্ণ ভালোবাসা এবং পূর্ণ প্রেমের প্রয়োজন এবং পূর্ণ ভালোবাসা সৃষ্টি করার জন্য পূর্ণ ঐশী জ্ঞান বা মারেফাত আবশ্যক। সত্যিকার ত্যাগ স্বীকার করার জন্য অন্য কিছু নয় কেবল যে পূর্ণ ভালোবাসা এবং পূর্ণ মারেফাতের প্রয়োজন–এরই দিকে 'ইসলাম' শব্দটি ইঙ্গিত করছে। এর প্রতি ইঙ্গিত করে খোদা তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ

'লাই ইয়ানালাল্লাহা লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিন ইয়ানালুহুত তাকওয়া মিনকুম' (সূরা আল-হজ্জ: ৩৮)।

অর্থাৎ, তোমাদের কুরবানীর মাংস বা রক্ত কোন কিছুই আমার কাছে পৌঁছায় না, বরং কেবল আমাকে ভয় করার কুরবানী এবং আমার তাকওয়া অবলম্বন করার কুরবানীই আমার কাছে গৃহীত হয়।

জানার বিষয়, ইসলাম ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধানের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো 'ইসলাম' শব্দের অন্তর্নিহিত প্রকৃত মর্মার্থ যেন বাস্তবায়িত হয়। এই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য খোদার ভালোবাসা জাগ্রত করতে কুরআনের বিবিধ শিক্ষা সচেষ্ট। কখনো এটি খোদার সৌন্দর্য বর্ণনা করে, আবার কখনো তাঁর অনুগ্রহ স্মরণ করায়। কেননা অন্তরে কারও ভালোবাসা হয় তার সৌন্দর্যের কারণে জন্ম নেয় কিংবা তার অনুগ্রহের কারণে সৃষ্টি হয়। তদনুযায়ী, খোদাকে নিজ গুণাবলীতে এক এবং অদ্বিতীয় বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর মাঝে কোন খুঁত নেই। তিনি পূর্ণ গুণাবলীর সমষ্টি আর

পবিত্র শক্তিসমূহের আধার। তিনি সমস্ত সৃষ্টির ভিত্তি এবং যাবতীয় কল্যাণের উৎস এবং তিনি সর্বপ্রকার পুরস্কার ও শাস্তিপ্রদানের মালিক এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি দূরত্ব সত্ত্বেও সন্নিকটে বিদ্যমান এবং নৈকট্য সত্ত্বেও তিনি দূরে অবস্থিত। তিনি সবার ঊর্ধ্বে কিন্তু তাঁর নীচে আর কেউ আছে একথা বলা যায় না। তিনি সবচেয়ে গোপনীয় কিন্তু তাঁর চেয়েও বেশি প্রকাশ্য অন্য কেউ আছে একথা বলা যাবে না। তিনি নিজ অস্তিত্বে জীবিত আর প্রত্যেক সত্তা তাঁর কারণে জীবন্ত। তিনি নিজ সত্তায় অনাদি এবং প্রতিটি জিনিষ তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। তিনি যাবতীয় জিনিষের বাহক কিন্তু তিনি কারও দ্বারা বহনকৃত নন। এমন কোন বস্তু নেই যা তাঁকে ছাড়াই নিজে নিজে সৃষ্ট কিংবা তাঁর সাহায্য ছাড়া নিজেই বেঁচে থাকতে পারে। তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর পরিবেষ্টনকারী কিন্তু এই বেষ্টনী বোঝানো দুষ্কর। তিনি আকাশ এবং পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর জ্যোতি এবং প্রত্যেকটি জ্যোতি তাঁর দ্বারা আলোকিত এবং তাঁরই সত্তার প্রতিবিম্ব। তিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। এমন কোন আত্মা নেই যা তাঁর দ্বারা পালিত না হয়ে নিজ সত্তায় বর্তমান। আত্মার যাবতীয় ক্ষমতা নিজ থেকে সৃষ্ট নয় বরং তাঁরই প্রদত্ত।

তাঁর অনুগ্রহ দুই প্রকারঃ (১) প্রথম প্রকারের অনুগ্রহ মানবীয় কর্ম ছাড়াই আদি থেকে প্রকাশিত। যেমনঃ পৃথিবী, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, তারকাপুঞ্জ, জলরাশি, আগুন, বাতাস এবং এ জগতের সমস্ত ধূলিকণা- আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যা সৃষ্টি করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ আমাদের জন্মের পূর্বেই সরবরাহ করা হয়েছে। আর এসব করা হয়েছে আমাদের অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই। এতে আমাদের কর্মের কোন ভূমিকা ছিল না। কেউ কি বলতে পারে, সূর্য আমার কর্মের কারণে সৃষ্ট কিংবা পৃথিবী আমার আরেক শুদ্ধ কর্মের প্রতিফলস্বরূপ বানানো হয়েছে? মোট কথা, এটা সেই অনুগ্রহ যা মানুষ কিংবা তার কর্মের পূর্বেই প্রদর্শিত হয়েছে- যা কোন কর্মের প্রতিদান নয়। (২) দ্বিতীয় প্রকারের অনুগ্রহ মানুষের কর্মের দ্বারা অর্জিত হয়। এর ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, খোদা তা'লার সত্তা যাবতীয় ত্রুটিমুক্ত, সমস্ত প্রকার ক্ষতির ঊর্ধ্বে এবং তিনি চান, মানুষ যেন তাঁর মনোনীত শিক্ষানুযায়ী কর্ম করে দোষমুক্ত হয়। তিনি বলেন,

مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا

'মান কানা ফী হাযিহী আ'মা ফাহুয়া ফিল আখিরাতি আ'মা ওয়া আযাল্লু সাবীলা' (সূরা বনী ইসরাঈল: ৭৩)।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইহলোকে দৃষ্টিহীন থাকবে এবং সেই অমূল্য অস্তিত্বের দেখা পাবে না, মৃত্যুর পরও সে দৃষ্টিহীন থাকবে আর তার অন্ধকার দূরীভূত হবে না। কেননা, খোদাকে দেখার জন্য এই জগতেই ইন্দ্রিয় অর্পিত হয় এবং যে এই জগৎ থেকে এই ইন্দ্রিয় সঙ্গে নিয়ে না যাবে, সে পরকালেও খোদার দর্শন লাভ করতে পারবে না। এ আয়াত দ্বারা খোদা তা'লা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি মানুষের কাছে কি ধরনের উন্নতি আশা করেন, এবং মানুষ তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করে কতদূর অগ্রসর হতে পারে। এরপর খোদা তা'লা কুরআন শরীফে সেই শিক্ষাটি তুলে ধরছেন যার মাধ্যমে ও যার অনুসরণে ইহলোকেই তাঁর দর্শন লাভ করা সম্ভব। তিনি বলেন,

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا

'মান কানা ইয়ারজু লিক্বাআ রাব্বিহি ফাল্ ইয়ামাল্ আমালান সালিহান; ওয়ালা ইউশরিক বিইবাদাতি রাব্বিহী আহাদা' (সূরা আল-কাহফ: ১১১)।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সত্যিকার খোদা এবং সর্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌র দর্শন ইহলোকেই লাভ করতে চায় তার উচিত সে যেন নির্মল কলুষমুক্ত সৎকর্ম করে, এমন কর্ম যা লোক দেখানো নয়, যে কর্ম 'আমি অমুক, আমি তমুক'- এধরনের অহংকারও হৃদয়ে সৃষ্টি করে না। এ কর্ম যেন ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ না হয়, এর মাঝে খোদাপ্রেম বিরোধী কোন দুর্গন্ধও যেন না থাকে। বরং সে কর্ম যেন সততা ও নিষ্ঠাপূর্ণ হয়। একই সাথে সর্বপ্রকার অংশীবাদিতা (শির্ক) থেকে বিরত থাকাও অত্যাবশ্যক। সূর্য নয়, চন্দ্র নয়, আকাশের তারা নয়, বায়ু নয়, আগুন নয়, পানি নয়, আর পৃথিবীর অন্য কোন বস্তুকেও যেন উপাস্য বানানো না হয়। পার্থিব উপকরণকে যেন এমন মর্যাদা দেয়া না হয় এবং এগুলির উপর যেন এমনভাবে নির্ভর করা না হয় যাতে মনে হয়, এগুলিও বুঝি খোদার সমকক্ষ। নিজ সাহসিকতা ও প্রচেষ্টাকে গ্রহণযোগ্য কিছু মনে করাও ঠিক নয়। কেননা, এটাও এক ধরনের শির্ক বরং সমস্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে

এটাই ভাবা উচিত, আমরা কিছুই করি নি। নিজের বিদ্যায় অহংকার প্রদর্শন করা আর নিজের কর্মে গর্ব করাও উচিত নয়। বরং নিজেকে সত্যি সত্যিই একটি অজ্ঞ ও অলস সত্তা জ্ঞান করা উচিত। আত্মা যেন সর্বদা খোদার সম্মুখে অবনত থাকে। দোয়ার দ্বারা তাঁর আশিসকে আকর্ষণ করা উচিত। পিপাসিত ও অসহায় এক ব্যক্তি যখন তার সামনে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির ঝরনা দেখতে পায় তখন সে যেভাবে পড়িমরি করে কোনমতে সেখানে পৌঁছে নিজের মুখ ঝরনার পানিতে দিয়ে পিপাসা নিবারণ করে আর তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্তসে মুখ সরায় না–মানুষ যেন খোদার দরবারে অনুরূপ হয়ে যায়। অতঃপর আমাদের খোদা কুরআন শরীফে স্বীয় গুণাবলী সম্বন্ধে বলেন,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস্ সামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ' (সূরা আল-ইখলাস: ২-৫)।

অর্থাৎ, সেই খোদাই হলেন তোমাদের প্রভু যিনি নিজ সত্তায় এবং স্বীয় গুণাবলীতে অদ্বিতীয়। অন্য কোন সত্তা তাঁর মত অনাদি ও অমর নয়। অন্য কিছুর বৈশিষ্ট্যাবলী খোদার গুণাবলীর অনুরূপ নয়। মানুষের বিদ্যা শিক্ষকের মুখাপেক্ষী, তদুপরি তা সীমাবদ্ধ, কিন্তু খোদার জ্ঞান কোন শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল নয়, অনুরূপভাবে সেটি অসীম। মানুষের শ্রবণশক্তি বাতাসের মুখাপেক্ষী এবং তাও সীমাবদ্ধ। কিন্তু খোদার শ্রবণ ক্ষমতা নিজ শক্তিতে কর্মরত এবং তা সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের দৃষ্টিশক্তি সূর্য কিংবা অন্য কোন আলোর উপর নির্ভরশীল এবং তার নির্দিষ্ট গণ্ডীও রয়েছে; কিন্তু খোদার দৃষ্টি স্বীয় জ্যোতিঃ দ্বারা কার্যকর এবং তা অসীম। অনুরূপভাবে, মানুষের সৃষ্টিশক্তি জড় পদার্থের উপর নির্ভরশীল এবং তা সময়সাপেক্ষ বিষয় ও সীমাবদ্ধ; কিন্তু খোদার সৃষ্টি-ক্ষমতা কোন উপাদানের মুখাপেক্ষী নয়, সময়সাপেক্ষ কিংবা সীমিতও নয়। কেননা তাঁর সমস্ত গুণাবলী অনন্য ও অতুলনীয়। নিজ সত্তায় তিনি যেমন অদ্বিতীয় তেমনি তাঁর গুণাবলীও অতুলনীয়। তিনি যদি একটি বৈশিষ্ট্যে অসম্পূর্ণ হন তবে সমস্ত বৈশিষ্ট্যাবলীতেও তিনি অসম্পূর্ণ সাব্যস্ত হবেন। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর সত্তার মত নিজ গুণাবলীতে অদ্বিতীয় ও

অতুলনীয় প্রমাণিত না হন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। উপরোক্ত আয়াতের পরবর্তী অংশের অর্থ হলো, খোদা কারো পুত্র নন এবং কেউ তাঁর পুত্রও নয়। কারণ, তিনি স্বীয় অস্তিত্বে স্বয়ং-স্বনির্ভর। তিনি পিতার মুখাপেক্ষীও নন আর পুত্রের মুখাপেক্ষীও নন। এই হলো কুরআন প্রদত্ত একত্ববাদের শিক্ষা যা ঈমানের মূলভিত্তি।

আমল বা কর্ম সম্বন্ধে কুরআন শরীফে পরিপূর্ণ শিক্ষা সম্বলিত এই আয়াতটি বিদ্যমান:

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈতাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশায়ি ওয়াল মুনকারে ওয়াল বাগয়ি' (সূরা আন-নাহল: ৯১)।

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যেন ন্যায়-বিচার কর এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হও। আর যদি এর চেয়ে বেশি পূর্ণতা লাভ করতে চাও তবে অনুগ্রহ (এহসান) কর। অর্থাৎ যারা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে নি তাদের প্রতিও উত্তম আচরণ ও অনুগ্রহ কর। আর যদি এর চেয়েও বেশি উন্নতি লাভ করতে চাও তবে ধন্যবাদ কিংবা কৃতজ্ঞতা বোধের আশায় নয় কেবল ব্যক্তিগত সহানুভূতি এবং স্বভাবজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবের প্রতি অনুগ্রহ কর, যেমন এক মা নিজ সন্তানের প্রতি কেবল এক স্বভাবজ মমতার টানে অনুগ্রহ করে থাকেন। কুরআন বলে, খোদা তা'লা তোমাদেরকে সব ধরনের অত্যাচার কিংবা মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে তা বলে বেড়ানো অথবা সত্যিকার সুহৃদ ব্যক্তির প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ–এসব থেকে বারণ করেন। খোদা তা'লা এই আয়াতের ব্যাখ্যা অপর এক স্থানে এভাবে প্রদান করেছেন:

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ﴿٩﴾

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ﴿١٠﴾

ওয়া ইয়ুত্ইমুনাত তা'মা আলা হুব্বিহি মিসকিনান ওয়া ইয়াতিমান ওয়া আসীরা। ইন্নামা নুতইমুকুম লিওয়াজহিল্লাহ। লা নুরীদু মিনকুম জাযাআন ওয়ালা শুকুরা' (সূরা আদ-দাহর: ৯-১০)।

অর্থাৎ, সত্যিকার পুণ্যবান ব্যক্তিরা যখন দরিদ্র, এতিম এবং বন্দিদের খাবার দেন তখন অন্য কোন কারণে নয় কেবল খোদার ভালোবাসায় তা দিয়ে থাকেন এবং তাঁরা তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, এই সেবা শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে, আমরা এর কোন প্রতিদান চাই না আর আমরা তোমাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশও চাই না। অতঃপর খোদা মানুষের কর্মের প্রতিফল সম্বন্ধে বলেন,

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۗ

জাযাউ সাইয়্যিআতিন সাইয়্যিআতুন মিসলুহা; ফামান আফা ওয়া আসলাহা ফা আজরুহু আলাল্লাহ্‌' (সূরা আশ-শুরা: ৪১)।

অর্থাৎ, মন্দের প্রতিদান হলো সমপরিমাণ মন্দ। দাঁতের পরিবর্তে দাঁত, চোখের স্থলে চোখ এবং গালির বদলে গালি। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করে, এমন 'ক্ষমা' যার ফলশ্রুতিতে মন্দের সৃষ্টি না হয়ে সংশোধন ঘটে, অর্থাৎ যে বিষয়টি ক্ষমা করা হলো সেটির কিছুটা সংশোধন হয় এবং অপরাধী তার অপরাধ থেকে ক্ষান্ত হয়– এই শর্ত সাপেক্ষে প্রতিশোধ নেয়ার চেয়ে ক্ষমা করা শ্রেয়, আর ক্ষমাকারী এর প্রতিদান পাবে। এখানে স্থানকালপাত্র বিবেচনা না করে এক গালে চড় খেয়ে অপর গালটাও এগিয়ে দেয়ার কথা বলা হয় নি। এরূপ শিক্ষা প্রজ্ঞা বিবর্জিত। কখনো কখনো মন্দ লোকদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন সৎকর্মশীলদের প্রতি অন্যায় করার মত ক্ষতিকর বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ

ইদ্‌ফা বিল্লাতি হিয়া আহসান; ফাইযাল্লাযি বাইনাকা ওয়া বাইনাহু আদাওয়াতুন কাআন্নাহু ওয়ালিউন হামীম' (সূরা হা-মীম আস-সাজদা: ৩৫)।

অর্থাৎ, কেউ যদি তোমার প্রতি সদাচরণ করে তুমি তার স্থলে তার পুণ্যের চেয়েও বেশি কর। এরূপ করলে তোমাদের মাঝে কোন প্রকার শত্রুতা যদি থেকেও থাকে তবে তা এমন বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হবে যেন সে ব্যক্তি তোমার একজন বন্ধু আবার আত্মীয়ও বটে। এছাড়াও আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ

وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا

‘ওয়ালা ইয়াগতাব বা’যুকুম বা’যা; আইয়ুহিব্বু আহাদুকুম আইয়াকুলা লাহমা আখিহী মায়তা’

‘লা ইয়াস্‌খার কওমুন মিন কওমিন, আসা আইয়াকুনু খাইরাম মিনহুম’

ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতক্বাকুম’

‘ওয়ালা তানাবাযু বিল আলকাব; বি’সাল ইসমুল ফুসুকু বা’দাল ঈমান’
‘ফাজতানিবুর রিজসা মিনাল আওসানি; ওয়াজতানিবু ক্বাওলায্ যূর’
‘ওয়া কুলু ক্বাওলান সাদীদা’

‘ওয়া’তাসিমু বিহাবলিল্লাহে জামিয়া’

[(১) সূরা আল-হুজুরাত: ১৩; (২) সূরা আল-হুজুরাত: ১২; (৩) সূরা আল-হুজুরাত: ১৪; (৪) সূরা আল-হুজুরাত: ১২; (৫) সূরা আল-হাজ্জ: ৩১; (৬) সূরা আল-আহযাব: ৭১; (৭) সূরা আলে ইমরান: ১০৪]।]

অর্থাৎ ‘তোমাদের কেউ যেন অপরের নিন্দা না করে, তোমরা কি মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ কর? আর এক জাতি যেন অপর কোন জাতির প্রতি এই বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে যে, আমরা উঁচু বংশের মানুষ আর এরা নীচ বংশীয়, তারা তোমাদের চেয়ে উত্তমও হতে পারে। খোদার নিকট সে-ই সবচেয়ে সম্মানিত যে পুণ্যে এবং খোদা-ভীতিতে বেশি অগ্রগামী। জাতিগত বিভক্তির কোন মূল্য নেই। মানুষ বিরক্ত হয় এবং অপমানিত বোধ করে এমন মন্দ নামে তাদেরকে ডেকো না। তা

না হলে তোমরা খোদার নিকট দুষ্কৃতকারী বলে গণ্য হবে। মূর্তিপূজা এবং মিথ্যাচার থেকে বিরত থেকো– কেননা এই উভয় কর্মই অপবিত্র। আর কথা বলার সময় তোমরা প্রজ্ঞাপূর্ণ ও যুক্তিসম্মত বাক্যালাপ করবে। বাজে কথা বলা থেকে বিরত থেকো এবং তোমাদের শরীরের সমস্ত অঙ্গ এবং সকল ইন্দ্রিয় যেন খোদার আনুগত্য করে। আর তোমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর আনুগত্যে নিয়োজিত থেকো'। আবার অপর এক স্থলে খোদা বলেছেন,

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝٢ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٣ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٥ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٦
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٧ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٨
ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٩

'আলহাকুমুত তাকাসুর। হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির। কাল্লা সাওফা তা'লামুন। সুম্মা কাল্লা সাওফা তা'লামুন। কাল্লা লাও তা'লামুনা ইলমাল ইয়াকীন। লাতারাউন্নাল জাহীম। সুম্মা লাতারাউন্নাহা আইনাল ইয়াকীন। সুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াওমাইযিন আনিন নাঈম' (সূরা আত-তাকাসূর: ২-৯)।

হে খোদাবিমুখ মানুষ! কবরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত পার্থিব লোভ-লালসা তোমাদেরকে খোদা সম্পর্কে উদাসীন করে রাখে। তথাপি তোমরা উদাসীনতায় ক্ষান্ত হও না। এটা তোমাদের ভ্রান্তি এবং অতি সত্ত্বর তোমরা জানতে পারবে। আমি আবার বলছি, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ কর তবে তোমরা সেই জ্ঞান দ্বারা চিন্তা করে নরক দর্শন করতে পারতে এবং জানতে পারতে যে, তোমাদের জীবন একটি নারকীয় জীবন। আর যদি তোমরা এর চেয়ে গভীর মারেফাত অর্জন কর তবে তোমরা পূর্ণ বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখতে পাবে, তোমাদের জীবনটি নারকীয়। এরপর এমন দিনও আসন্ন যখন তোমরা নরকে নিক্ষিপ্ত হবে এবং ভোগ বিলাসের ও সীমালংঘনের প্রতিটি কর্ম সম্বন্ধে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। অর্থাৎ শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে তোমরা অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাসে উপনীত হবে।

উক্ত আয়াতগুলিতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, বিশ্বাস তিন প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমতঃ সেই বিশ্বাস যা কেবল জ্ঞান এবং অনুমান

ভিত্তিক হয়ে থাকে। যেমন দূর থেকে ধোঁয়া দেখে কেউ চিন্তা এবং বুদ্ধি খাঁটিয়ে বুঝে যায়, ঐ স্থানে নিশ্চয় আগুন জ্বলছে। দ্বিতীয় প্রকারের বিশ্বাস হলো, সে যদি স্বচক্ষে আগুনটিকে প্রত্যক্ষ করে। অতঃপর তৃতীয় প্রকার বিশ্বাস হলো, ধরুন, সে যদি আগুনের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে এর দাহিকা শক্তির স্বাদ গ্রহণ করে। সুতরাং এই হলো তিন ধরনের বিশ্বাস। ইলমুল একীন (জ্ঞান দ্বারা অর্জিত বিশ্বাস), আইনুল একীন (চোখে দেখা বিশ্বাস) এবং হাক্কুল একীন (অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস)। আল্লাহ্ তা'লা উক্ত আয়াতে একথা বুঝিয়েছেন, মানব জীবনের সমস্ত স্বস্তি ও প্রশান্তি খোদা তা'লার নৈকট্য ও ভালোবাসা লাভের মাঝে নিহিত। আর মানুষ যখন তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথিবীর প্রতি আসক্ত হয় তখন সেটিই হয় নারকীয় জীবন এবং নারকীয় জীবন সম্বন্ধে শেষ মুহূর্তে হলেও প্রত্যেকেই অবহিত হয়, যদিও তখন নিজ ধন-সম্পদ ফেলে এবং পার্থিব সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে সে মৃত্যুর দ্বারে এসে উপনীত হয়। আরেক স্থলে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ

'ওয়ালিমান খাফা মাক্বামা রাব্বিহি জান্নাতান' (সূরা আর-রহমান: ৪৭)।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি খোদার মান ও মর্যাদার কথা চিন্তা করে এবং তার নিকট একদিন জবাবদিহিতার ভয়ে পাপকে পরিত্যাগ করে তাঁর জন্য দু'টি স্বর্গ অবধারিত। (১) প্রথমতঃ তাঁকে ইহলোকেই স্বর্গীয় জীবন প্রদান করা হবে এবং তাঁর মধ্যে একটি পবিত্র পরিবর্তনের সৃষ্টি হবে। খোদা তা'লা স্বয়ং তাঁর রক্ষক ও অভিভাবক হয়ে যাবেন। (২) দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর পর তাঁকে চিরন্তন স্বর্গ প্রদান করা হবে। কেননা, সে খোদাভীতি অবলম্বন করেছে এবং পার্থিবতা এবং প্রবৃত্তির আকর্ষণের উপর তাঁকে প্রাধান্য দিয়েছে। অতঃপর, কুরআন শরীফের অপর এক স্থলে খোদা তা'লা বলেন,

اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۠ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ۝ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ۝ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ۝ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝ فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ۝ وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ۝ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ ۝ قَوَارِيْرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۝ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ۝

"ইন্না আ'তাদনা লিল কাফেরীনা সালাসিলা ওয়া আগলালান ওয়া সায়িরা। ইন্নাল আবরারা ইয়াশরাবুনা মিন কা'সিন কানা মিযাজুহা কাফুরা। আয়নান ইয়াশরাবু বেহা ইবাদুল্লাহে ইউফাজ্জেরুনাহা তাফজীরা। ওয়া ইউসকাওনা ফিহা কা'সান কানা মিযাজুহা যানজাবীলা। আইনাল ফিহা তুসাম্মা সালসাবীলা" (সূরা আদ-দাহর: ৫, ৬, ৭, ১৮, ১৯)।

অর্থাৎ, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য, যাদের হৃদয়ে আমার ভালোবাসা নেই, যারা পার্থিবতার মোহে আসক্ত তাদের জন্য আমি বেড়ি, গলায় বাঁধার শিকল এবং তাদের অন্তঃকরণ দগ্ধ করার ব্যবস্থা করে রেখেছি। পার্থিব লোভ-লালসার বেড়ী তাদের পায়ে এবং খোদা-বিমুখতার শিকল রয়েছে তাদের গলায়, ফলে তারা মাথা তুলে উপরদিকে দেখতে পারে না, পৃথিবীর প্রতিই ক্রমান্বয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। পার্থিব মোহ-লালসার পীড়ন সব সময়ে তাদের মনে অনুভূত হয়। কিন্তু যারা পুণ্যবান– তাঁরা এ জগতেই এমন 'কাফুরী' শরবত পান করে চলেছেন যা তাঁদের হৃদয়ে জাগতিক মোহকে প্রশমিত করে দিয়েছে, আর পার্থিব লোভ-লালসার পিপাসা নিবারিত করেছে। 'কাফুরী' শরবতের একটি ঝরনা তাদের প্রদান করা হয়। তাঁরা সেটিকে খনন করতে করতে একটি খালের রূপ দান করেন যেন কাছের এবং দূরের তৃষ্ণার্তরা এথেকে উপকৃত হতে পারে। সেই ঝরনা যখন খালের রূপ ধারণ করে এবং তাদের বিশ্বাস উন্নতি করতে থাকে সেই সাথে খোদাপ্রেম যখন বৃদ্ধি লাভ করে তখন তাঁদের অপর একটি শরবত পান করানো হয় যাকে 'যানজাবিলী' শরবত বলা হয়। অর্থাৎ প্রথমে তাঁরা 'কাফুরী' শরবত পান করে যার কাজ শুধু পার্থিব মোহকে তাঁদের মনে স্তিমিত করা। কিন্তু এরপরও খোদাপ্রেমের উষ্ণতা হৃদয়ে জাগ্রত করার জন্য তাঁরা একটি উষ্ণ পানীয়ের মুখাপেক্ষী। কেননা কেবল মন্দকে ত্যাগ করাই পুণ্যের চরম উৎকর্ষ সাধন নয়। অতএব এরই নাম 'যানজাবিলী' শরবত। এই ঝরনার নাম 'সালসাবিল' যার অর্থ হচ্ছে, খোদার পথ অন্বেষণ কর। অপর এক স্থলে খোদা তা'লা পুনরায় বলেছেন:

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝١٠ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝١١

'ক্বাদ আফলাহা মান যাক্কাহা; ওয়াক্বাদ্ খাবা মান দাস্সাহা' (সুরা আশ-শামস: ১০, ১১)।

অর্থাৎ, সে ব্যক্তিই প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার শৃংখল থেকে মুক্তি লাভ করেছে এবং স্বর্গীয় জীবনের অধিকারী হয়েছে, যে নিজের অন্তরকে পবিত্র করেছে, এবং যে নিজের আত্মাকে মাটিতে পুঁতে ফেলেছে এবং আকাশ পানে তাকায়নি সে বিফল ও অকৃতকার্য হয়েছে।

যেহেতু এ সমস্ত আধ্যাত্মিক স্তর ও পদমর্যাদা কেবলমাত্র মানবীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জিত হতে পারে না তাই কুরআনের বিভিন্ন স্থলে প্রার্থনা করার জন্য আর সাধনার জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যেমন, খোদা তা'লা বলেন,

ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

'উদ্‌উনী আস্‌তাজিব লাকুম' (সূরা আল-মু'মিন: ৬১)।

অর্থাৎ প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করবো। পুনরায় খোদা বলছেন,

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

'ওয়া ইযা সাআলাকা ঈবাদী আন্নি ফাইন্নি ক্বারীব। উজীবু দাওয়াতাদ দাঈ ইযা দাআনি ফাল ইয়াসতাজীবু লী ওয়াল ইউমিনু বী লাআল্লাহুম ইয়ারশুদুন' (সূরা আল-বাকারা: ১৮৭)।

অর্থাৎ, আমার দাসরা যদি আমার সত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে, তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ কী, এবং খোদা যে বর্তমান, কীভাবে জানবো? এর উত্তর হলো, আমি অতি নিকটেই আছি এবং যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেই। সে যখন আমায় ডাকে তখন আমি তার ডাক শুনি এবং তার সঙ্গে কথা বলি। সুতরাং তাদের নিজেদেরকে এমনভাবে গড়া উচিত যাতে আমি তাদের সাথে কথা বলতে পারি। তারা যেন আমার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে যাতে তারা আমার পথ লাভ করতে পারে। খোদা পুনরায় বলছেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহ্‌দিয়ান্নাহুম সুবুলানা' (সূরা আনকাবূত: ৭০)।

অর্থাৎ যারা আমার পথে এবং আমার খোঁজে নানা ধরনের সাধনা ও পরিশ্রম করে, আমি তাদেরকে আমার পথের সন্ধান প্রদান করি। খোদা আবার বলেন,

وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

'ওয়া কূনূ মাআস্ সাদিক্বীন' (সূরা আত-তাওবা: ১১৯)।

অর্থাৎ, তোমরা যদি খোদার সাক্ষাৎ লাভ করতে চাও তবে দোয়াও করো আর চেষ্টাও কর এবং সৎ ও সত্যবাদীদের সাহচর্য লাভ কর। কেননা এ কাজে সৎ সাহচর্য অবলম্বন করাটাও একটি শর্ত।

এই সকল বিধান মানুষকে ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে সফল করে। কেননা, আমি উল্লেখ করেছি, কুরবানীর ছাগলের মত খোদার সামনে নিজের মাথা পেতে দেয়াটাই প্রকৃত ইসলাম। একই সাথে ইসলাম অর্থ নিজের সমস্ত ইচ্ছা থেকে বিরত হওয়া, খোদার ইচ্ছা এবং সন্তুষ্টিতে মগ্ন হয়ে এবং খোদার সত্তায় বিলীন হয়ে এক প্রকার মৃত্যুকে গ্রহণ করা এবং অন্য কোন কারণে নয় বরং কেবল তাঁর ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে প্রেমাবেগে তাঁর আনুগত্য করা। আর এমন দৃষ্টি লাভ করা যা খোদার মাধ্যমে দেখে ও এমন শ্রবণ শক্তি অর্জন করা যা খোদার মাধ্যমে শোনে এবং এমন অন্তর সৃষ্টি করা যা সম্পূর্ণভাবে তাঁর দিকে অবনত এবং এমন মুখ লাভ করা যা তাঁর আদেশে কথা বলে। এটা সেই আধ্যাত্মিক মার্গ যেখানে এসে খোদা-অন্বেষণের সমস্ত পথ শেষ হয় এবং মানবীয় শক্তি নিজ সাধ্যানুযায়ী সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে, মানুষের কুপ্রবৃত্তির উপর পূর্ণরূপে একটি মৃত্যু এসে যায়। তখন খোদার কৃপা নিজের জীবন্তবাণী এবং জাজ্বল্যমান জ্যোতি দ্বারা তাঁকে পুনরায় জীবন দান করে এবং সে খোদার সুমধুর বাণী দ্বারা ভূষিত হয় এবং এমন সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্যোতি যার মূল তত্ত্বকে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি আবিষ্কার করতে পারে না আর দৃষ্টি যার রহস্য উদঘাটন করতে পারে না– তা নিজে নিজেই মনের নিকটতর হয়ে যায়। খোদা বলেছেন:

نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

'নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ' (সূরা ক্বাফ: ১৭)

অর্থাৎ আমরা তার জীবনশিরা থেকেও অধিক নিকটে বিরাজমান। অনুরূপভাবে খোদা তাঁর নৈকট্য দ্বারা নশ্বর মানুষকে ভূষিত করেন। এরপর এমন এক পর্যায়ও লাভ হয় যখন অন্ধত্ব বিদূরীত হয়ে দৃষ্টি আলোকিত হয় এবং মানুষ তার প্রভুকে নতুন চোখে দেখে এবং তাঁর বাণী

শোনে এবং তাঁর জ্যোতির একটি চাদরে নিজেকে আবৃতাবস্থায় আবিষ্কার করে। এমতাবস্থায় ধর্মের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় এবং মানুষ নিজের খোদাকে দর্শনের পরে হীন জীবনের নোংরা আচ্ছাদন নিজের উপর থেকে সরিয়ে ফেলে এবং একটি জ্যোতির্ময় পোশাক পরিধান করে। সে তখন কেবল অঙ্গীকারস্বরূপ খোদা দর্শন এবং স্বর্গ লাভের আশায় পরকালের প্রতীক্ষায় থাকে না বরং এখানেই এবং ইহজগতেই খোদা-দর্শন, ঐশীবাণী এবং স্বর্গীয় নেয়ামত লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٣١﴾

'ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহু সুম্মাস্তাকামু তাতানাযযালু আলাইহিমুল মালাইকাতু আল্লা তাখাফূ ওয়ালা তাহ্যানূ ওয়া আবশিরু বিল জান্নাতিল্লাতি কুনতুম তুআদুন' (সূরা হা-মীম আস-সাজদা: ৩১)।

অর্থাৎ যারা বলে, আমাদের খোদা, এমন খোদা যিনি সমস্ত পূর্ণগুণের অধিকারী, যার সত্তার কিংবা গুণরাজির অন্য কেউ সমতূল্য নাই– একথা ঘোষণা দিয়ে তাঁরা অবিচল থাকে। যত প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগ আর বিপদ আসুক এমনকি তাঁরা মৃত্যুর মুখোমুখি হলেও তাদের বিশ্বাস এবং নিষ্ঠায় কোন তারতম্য হয় না, তাঁদের প্রতি ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয় এবং খোদা তাঁদের সাথে বাক্যালাপ করেন। আর বলেন, তোমরা বিপদ এবং ভয়ঙ্কর শত্রুদের ভয় পেও না। অতীতের কোন দুর্ঘটনায় দুঃখিত হবার প্রয়োজনও নেই। আমি তোমাদের সঙ্গী এবং ইহজগতেই তোমাদের সেই স্বর্গ প্রদান করবো যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দান করা হয়েছিল। সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, এসব কথা সাক্ষ্যবিহীন নয় কিংবা এগুলো অপূর্ণ থেকে যাওয়া প্রতিশ্রুতিও নয় বরং সহস্র সহস্র হৃদয়বান মানুষ ইসলাম ধর্মে এই আধ্যাত্মিক স্বর্গের স্বাদ গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলামই সেই ধর্ম যার প্রকৃত অনুসারীদেরকে খোদা তা'লা পূর্ববর্তী পুণ্যবানদের উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করেছেন, তাঁদের নানাবিধ পুরস্কারাদি এই সৌভাগ্যবান জাতিকে প্রদান করেছেন এবং কুরআন শরীফে তাঁর নিজের শিখানো দোয়াটি তিনি গ্রহণ করেছেন। সেটি হলো,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

'ইহদনাদিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকিম। সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায্ যাল্লীন' (সূরা আর-ফাতিহা: ৬, ৭)।

'আমাদের সেই পুণ্যবানদের পথ প্রদর্শন কর যাদের তুমি সব ধরনের পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করেছো। অর্থাৎ তোমার কাছ থেকে যারা সব কল্যাণ লাভ করেছে এবং তোমার কথোপকথন ও বাক্যালাপ অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেছে এবং তোমার পক্ষ থেকে প্রার্থনার কবুলিয়ত লাভ করেছে এবং সর্বদা তোমার সাহায্য, সমর্থন এবং পথ-নির্দেশনা যাঁদের পথের পাথেয়। আর তাদের পথ থেকে আমাদের রক্ষা কর যারা তোমার ক্রোধে নিপতিত এবং যারা তোমার নির্দেশিত পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়েছে।' পাঁচ বেলা নামাযে পঠিত এই দোয়াটি জানাচ্ছে, অন্ধ অবস্থায় পার্থিব জীবন একটি নরক বিশেষ। আবার এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণও এক ধরনের নরক। প্রকৃতপক্ষে সে-ই খোদার সত্যিকার অনুসরণকারী এবং মুক্তিপ্রাপ্ত যে খোদাকে চিনে নেয় এবং তাঁর সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। কেবলমাত্র এমন ব্যক্তিই পাপ পরিত্যাগ করতে পারে ও খোদার প্রেমে মত্ত হতে পারে। সুতরাং যে হৃদয় খোদার বাণী ও বাক্যালাপ নিশ্চিতভাবে লাভ করার প্রত্যাশী নয় সেটি এক মৃত হৃদয় আর যে ধর্ম উৎকর্ষের এই মার্গে পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখে না এবং এর প্রকৃত অনুসারীদের খোদার সাথে কথোপকথনে ভূষিত করতে অক্ষম– সে ধর্ম খোদার পক্ষ থেকে নয় এবং এতে সত্যের কোন লক্ষণ নেই। অনুরূপভাবে, যে নবী মানুষদের এমন পথে পরিচালিত করে নি, যে পথে মানুষ খোদার বাণী ও বাক্যালাপ লাভে প্রত্যাশী হয় এবং পূর্ণ তত্ত্ব-জ্ঞান লাভে আকাঙ্ক্ষী হয়– সে নবীও খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হতে পারে না– সে খোদার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে। কেননা, খোদার সত্তা এবং তাঁর শাস্তি ও পুরস্কার প্রদানের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা মানব জীবনের অন্যতম লক্ষ্য, যার মাধ্যমে সে পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু সেই অদৃশ্য খোদার পক্ষ থেকে 'আনাল মওজুদ' (আমি সত্যিই বর্তমান)– এই ধ্বনি শ্রবণ না করা পর্যন্ত তাঁর সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করা কি করে সম্ভব? তাঁর পক্ষ থেকে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী অবলোকন না করা পর্যন্ত মানুষের পক্ষে তাঁর সত্তায় পূর্ণ

বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা কীভাবে সম্ভব? বিচার, বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে খোদার সত্তা সম্বন্ধে কেবল এটুকু বলা যায় আর বিশ্ব-জগৎ এবং এর সুপরিকল্পিত সুচারু ব্যবস্থাপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে মানব বিবেক কেবল এই মত প্রকাশ করে, এ সমস্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ সৃষ্টির একজন 'স্রষ্টা থাকা উচিত'। কিন্তু একজন 'স্রষ্টা' যে সত্যিই আছেন এটা প্রমাণ করতে পারে না। আর একথা স্পষ্ট, 'থাকা উচিত' একটি ধারণা মাত্র এবং 'আছেন' একটি প্রামাণ্য সত্য। এই দুই-এর মাঝে তফাৎ অতীব পরিষ্কার। প্রথম ক্ষেত্রে কেবল স্রষ্টার প্রয়োজন ব্যক্ত করা হয়েছে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাঁর সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে। মোটকথা, বর্তমান যুগে, বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের এক প্রবল বন্যা যখন বয়ে চলেছে তখন একজন সত্যান্বেষীকে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ভুলে গেলে চলবে না। সত্য ধর্ম কেবল সেটিই যা নিশ্চিত বিশ্বাসের মাধ্যমে খোদার দর্শন লাভ করাতে সক্ষম এবং যা খোদার সাথে বাক্যালাপ ও কথোপকথনের স্তরে মানুষকে উন্নীত করতে সক্ষম এবং যা মানুষকে খোদার বাণী লাভের মর্যাদায় ভুষিত করতে সক্ষম। অনুরূপভাবে, সত্য ধর্ম নিজের আধ্যাত্মিক প্রভাব এবং জীবন সঞ্চারী বৈশিষ্ট্য দ্বারা মানুষের মনকে পাপের কালিমা থেকে মুক্ত করার সামর্থ্য রাখে। এছাড়া বাদ বাকী সব প্রতারণা মাত্র।

এবার আমরা এদেশের কয়েকটি ধর্মমতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখবো এরা কি খোদার পূর্ণ পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে মানবকে নিশ্চিত বিশ্বাসের স্তরে পৌছাতে সক্ষম এবং এদের ঐশী পুস্তকে কি খোদার বাণী প্রাপ্তির নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান? আর যদি এ ধরনের প্রতিশ্রুতি থেকেও থাকে তবে এদের মাঝে এমন কোন জীবন্ত উদাহরণ এ যুগে বিদ্যমান আছে কিনা? এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রথমে উল্লেখযোগ্য হলো সেই ধর্মমত যাকে খ্রিষ্টধর্ম বলা হয়। এ ধর্ম সম্পর্কে আমাদের বেশি কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। কেননা, খ্রিষ্টানদের মাঝে এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, মসীহ্‌র যুগের পরে ঐশী-বার্তা ও বাণী লাভের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে এই স্বর্গীয় পুরস্কারটি ভবিষ্যতের জন্য নয় বরং অতীতের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পুরস্কার লাভের এখন আর কোন পথ নেই। কিয়ামত পর্যন্ত এখন আছে শুধু হতাশা আর কল্যাণ লাভের সকল দুয়ার রুদ্ধ। সম্ভবতঃ এ কারণেই 'মুক্তিলাভের' জন্য একটি নতুন 'পন্থা' উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং অভিনব একটি

'ব্যবস্থাপত্র' আবিষ্কার করা হয়েছে যা গোটা জগতের সমস্ত নিয়ম-নীতি থেকে পৃথক, বিবেক-বুদ্ধি ও ন্যায়বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী আর দয়া ও কৃপার বিরোধী। বলা হয়, হযরত মসীহ্ আলায়হেস্ সালাম সমস্ত জগতের পাপ নিজের দায়িত্বে নিয়ে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন যেন তার মৃত্যু দ্বারা অন্যরা মুক্তি পায় এবং খোদা পাপীদের উদ্ধার করার লক্ষ্যে নিজের নিষ্পাপ পুত্রকে মেরে ফেলেছেন! কিন্তু আমি কোনমতেই বুঝতে পারি না, ছেলের এ ধরনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে অন্যদের মন পাপের অপবিত্র স্বভাব থেকে কীভাবে মুক্ত ও পবিত্র হয়? একজন নিষ্পাপ ব্যক্তির হত্যার ফলশ্রুতিতে কেমন করে অন্যরা অতীতের সব পাপ মোচনের সার্টিফিকেট লাভ করতে পারে? এ পন্থায় বরং ন্যায় বিচার এবং খোদার অনুগ্রহ উভয়কেই নির্ঘাত জলাঞ্জলি দিতে হয়। কারণ, একে তো পাপীর স্থলে নিষ্পাপকে ধরাটাই অবিচার, তার উপর স্বীয় পুত্রকে এরূপ নির্মমভাবে হত্যা করা খোদার কৃপাবিরোধী কাজ! আর এই পদক্ষেপে বিন্দুমাত্র লাভও হয় নি। আমি এখনই উল্লেখ করেছি যে, খোদা সম্বন্ধে মারেফাতের অভাব পাপের আধিক্যের প্রধান কারণ। সুতরাং 'কারণ'-এর উপস্থিতিতে ফলাফলকে কীভাবে অস্বীকার করা সম্ভব? 'কারণ' সর্বদা নিজের ফলাফলের প্রতি দিকনির্দেশ করে। আশ্চর্যের বিষয়, পাপের 'কারণ' খোদার মারেফাতের অভাব যথারীতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এর ফলাফল অর্থাৎ পাপে নিমগ্ন অবস্থা বিলুপ্ত হয়ে গেছে– এটা কী ধরনের দর্শন? আমাদের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে হাজার বার সাক্ষ্য দেয়, কোন কিছুর প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া সে বস্তুর প্রতি ভালোবাসাও সৃষ্টি হতে পারে না বা তার প্রতি ভীতিরও সঞ্চার হয় না, আর তার সঠিক মূল্যায়নও হয় না। একথা স্পষ্ট, মানুষের একটি কাজ সম্পাদন করা বা তা পরিত্যাগ করার বিষয়টি হয় 'ভয়ের' সাথে না হয় 'ভালোবাসার' সাথে সম্পৃক্ত। 'ভালোবাসা' এবং 'ভীতি' উভয়ই সংশিষ্ট বিষয়ের 'পূর্ণ-জ্ঞান' থেকে সৃষ্টি হয়। সুতরাং যে ক্ষেত্রে 'মারেফাত নেই সেক্ষেত্রে ভালোবাসাও নেই আর ভীতিও নেই।

হে আমার স্নেহাস্পদ ও প্রিয় ব্যক্তিগণ! সত্যের সমর্থনে এস্থলে আমি একথা বলতে বাধ্য, খোদা তা'লার মারেফাত সম্বন্ধে খ্রিষ্টানদের কাছে কোন স্বচ্ছ তত্ত্ব নেই। একদিকে ঐশীবাণী লাভের পথ আগের থেকেই রুদ্ধ, অপরদিকে মসীহ্ এবং হাওয়ারীদের পরে অলৌকিক

নিদর্শনাবলীও শেষ! বাকী রইল কেবল বুদ্ধি-বিবেচনার পথ– এক মনুষ্যপুত্রকে খোদা বানিয়ে এই পন্থাও তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল। আর যদি বর্তমান যুগে কাহিনী আকারে বিদ্যমান অতীতের সেই নিদর্শনাবলী উপস্থাপন করা হয় তবে একজন অস্বীকারকারী বলতে পারে, এগুলির প্রকৃত বিষয় কি ছিল আর এগুলো কতটা বাড়িয়ে বলা হয়েছে, তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। কেননা, এ কথায় সন্দেহ নেই যে, বাড়িয়ে বলা ইঞ্জিল-লেখকদের অভ্যাস ছিল। একটি ইঞ্জিলে এই বাক্য বিদ্যমান, 'মসীহ্ এত কাজ করে গেছেন যদি তা লিপিবদ্ধ করা হতো তাহলে পৃথিবীতে আটতো না'। লক্ষ্য করুন, যে কাজ বাস্তবে সম্পাদিত হবার পরও পৃথিবীতে তার স্থান সংকুলান সম্ভব হয়েছে, লিখিত আকারে পৃথিবীতে স্থান সংকুলান সম্ভব নয়– এ ধরনের দর্শন, এ ধরনের উদ্ভট যুক্তি কি কারও বোঝার জো আছে?

এছাড়া হযরত মসীহ্ আলাইহেস সালামের নিদর্শনাবলী মূসা নবীর নিদর্শনাবলীর চেয়ে বড় কিছু নয়। আবার ইলিয়াস নবীর নিদর্শনাবলীর সঙ্গে যখন মসীহ্র নিদর্শনাবলীর তুলনা করা হয় তখন ইলিয়াস নবীর পাল্লাটিই বেশি ভারী বলে মনে হয়। সুতরাং নিদর্শনাবলীর কারণে যদি কেউ খোদা হতে পারতো তবে এ সমস্ত মহান ব্যক্তিগণও ঈশ্বরত্ব লাভের যোগ্য। আর মসীহ্ নিজেকে যে খোদার পুত্র বলেছেন কিংবা অপর কোন পুস্তকে তাকে খোদার পুত্র বলেছেন কিংবা অপর কোন পুস্তকে তাকে খোদার পুত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, এ ধরনের লেখা থেকে মসীহ্র ঈশ্বরত্ব সাব্যস্ত করা সঠিক নয়। বাইবেলে অনেককে ঈশ্বর-পুত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে বরং কিছু সংখ্যক লোককে ঈশ্বরও বলা হয়েছে। এসত্ত্বেও মসীহ্কে বিশেষত্ব প্রদান করা অযৌক্তিক। তাদের পুস্তকে মসীহ্ ব্যতীত যদি অন্য কাউকে 'খোদা' কিংবা 'ঈশ্বর-পুত্র' উপাধি না-ও দেয়া হতো তবুও এ ধরনের লেখাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা বোকামি। কেননা খোদার বাণীতে এ ধরনের অনেক 'রূপক' বিষয়াবলী থাকে। কিন্তু বাইবেল অনুযায়ী অন্যান্য মানুষও যখন ঈশ্বরপুত্র আখ্যায়িত হবার ক্ষেত্রে মসীহ্র অংশীদার, তবে তাদেরকে এই শ্রেষ্ঠত্ব থেকে বঞ্চিত রাখার হেতু কি?

সুতরাং মুক্তি লাভের জন্য এই 'প্রকল্পের' উপর আস্থা ঠিক নয়। পাপ থেকে বিরত থাকার সাথে এই 'পদ্ধতির' কোন সম্পর্ক নেই। বরং

অন্যের মুক্তির জন্য আত্মহত্যা করাটাই পাপ। আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলতে পারি, মসীহ্ স্বেচ্ছায় ক্রুশকে গ্রহণ করেননি বরং দুষ্ট ইহুদীরা তাঁর সাথে যা-ইচ্ছে-তাই ব্যবহার করেছে এবং ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য মসীহ্ সমস্ত রাত একটি বাগানে অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রার্থনা করেছেন। তখন খোদা তা'লা তাক্ওয়ার কারণে তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করেন এবং তাঁকে ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন। একথা ইঞ্জিলেই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং মসীহ্ স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছেন এটা কত বড় একটা জঘন্য অপবাদ! এছাড়া, যদু মিঞা নিজের মাথায় পাথর মারলো আর এতে মধু মিঞার মাথা ব্যথা সেরে গেলো– একথা মানব-বিবেক মানতে পারে না।

হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি, হযরত মসীহ্ আলাইহেস সালাম নবী ছিলেন এবং আল্লাহ্ কর্তৃক স্বহস্তে পবিত্রকৃত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু যে সমস্ত উপাধি মসীহ্ এবং অন্য নবীদের সম্বন্ধে পুস্তকাদিতে বিদ্যমান তার কারণে আমরা তাঁকে কিংবা অন্য কোন নবীকে ঈশ্বর মানতে পারি না। এ বিষয়ে আমি নিজেও অভিজ্ঞতার অধিকারী। আমার উদ্দেশ্যে খোদার পবিত্র ওহীতে এমন সম্মান ও মর্যাদাসূচক শব্দ বিদ্যমান যার কোন উদাহরণ মসীহ্‌র বেলায় আমি কোন ইঞ্জিলে দেখি নি। তবে কি আমি সত্যি সত্যিই খোদা বা খোদা-পুত্র হবার দাবি করতে পারি? এখন রইল ইঞ্জিলের শিক্ষা। আমার মতে, পূর্ণ শিক্ষা সেটিই যা সমস্ত মানবীয় শক্তিকে সযত্নে লালন করে। আমি সত্যি সত্যিই বলছি, এ পূর্ণ শিক্ষা আমি কেবল কুরআন শরীফেই খুঁজে পেয়েছি। প্রতিটি বিষয়ে কুরআন ন্যায় ও প্রজ্ঞার প্রতি খেয়াল রাখে। উদাহরণস্বরূপ, ইঞ্জিলে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, এক গালে চড় খেয়ে দ্বিতীয় গালটিও পেতে দাও। কিন্তু কুরআন শরীফ আমাদের শিক্ষা দেয় এই আদেশ সর্বস্থলে বা সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য নয়। বরং স্থানকালপাত্রভেদে নিরুপণ করা উচিত, এটা কি ধৈর্য ধারণের সময় নাকি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্র? এটি কি ক্ষমার সুযোগ নাকি শাস্তি প্রদানের? বলা বাহুল্য, কুরআন প্রদত্ত এই শিক্ষা পরিপূর্ণ এবং এর অনুসরণ ব্যতিরেকে মানব সভ্যতা ধ্বংস হয় এবং পৃথিবীর নিয়ম-নীতি নষ্ট হয়। অনুরূপভাবে, ইঞ্জিলে বলা হয়েছে, তুমি কামাতুর দৃষ্টিতে পরস্ত্রীকে দেখো না। কিন্তু কুরআন বলে কামাতুর কিংবা ভালো– কোন দৃষ্টিতেই তুমি পরস্ত্রীকে দেখার অভ্যাস করবে না। কেননা এ জাতীয়

অভ্যাস তোমার অধঃপতনের কারণ হতে পারে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, চোখ যেন প্রায় বন্ধ আর দৃষ্টি যেন ঘোলাটে থাকে। লাগামহীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করা থেকে বিরত থেকো কেননা, এটাই মনের পবিত্রতা রক্ষা করার পদ্ধতি। এ যুগের বিরোধী গোষ্ঠী সম্ভবতঃ এর বিরোধিতা করবেন। কেননা, তাদের নতুন নতুন স্বাধীনতা লাভের প্রেরণা রয়েছে, কিন্তু মানব অভিজ্ঞতা স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে, এই পদ্ধতিই সঠিক। বন্ধুগণ! অবাধ অসংগত মেলামেশা এবং অশালীন দৃষ্টি নিক্ষেপের ফলাফল কখনই ভালো হয় না। ধরুন, কামাবেগ মুক্ত নয় এমন পুরুষ এবং কামাবেগ মুক্ত নয় এমন এক যুবতীকে অবাধ দেখা-সাক্ষাৎ, মেলামেশা ও আচরণের স্বাধীনতা প্রদান করলে তা হবে নিজ হাতে তাদেরকে ফাঁদে ফেলারই নামান্তর। অনুরূপভাবে, ইঞ্জিলে বলা হয়েছে ব্যভিচার ছাড়া অন্য কোন কারণে স্ত্রীকে তালাক দেয়া ঠিক নয়। কিন্তু কুরআন শরীফ অন্য কিছু ক্ষেত্রেও একে বৈধ ঘোষণা করে। উদাহরণস্বরূপ, স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পর প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং একজনের জীবন অপরের কারণে হুমকীর সম্মুখীন হয় অথবা স্ত্রী 'ব্যভিচার' না করলেও ব্যভিচার সংশিষ্ট বিষয়াদিতে লিপ্ত হয়েছে। অথবা তার শরীরে এমন কোন রোগ জন্মেছে যার সংস্পর্শে আসলে স্বামীর মৃত্যু অনিবার্য অথবা অন্য এমন কোন কারণ সৃষ্টি হয়েছে যার প্রেক্ষিতে স্বামীর দৃষ্টিতে তালাক দেয়া বাঞ্ছনীয়– এসব ক্ষেত্রে তালাক দিলে স্বামীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

এখন পুনরায় আমি মূল বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে বলছি, নিশ্চিতভাবে মনে রেখো! খ্রিষ্টান সাহেবদের কাছে পরিত্রাণ এবং পাপ থেকে মুক্তির কোন সত্যিকারের পদ্ধতি নেই। কেননা, পরিত্রাণ বলতেই মানুষের এমন এক স্তরকে বুঝায় যে অবস্থায় উপনীত হয়ে সে পাপ কর্মে আর দুঃসাহস দেখাতে পারে না এবং তার মধ্যে খোদার-প্রেম এত উন্নতি লাভ করে যার ফলে জাগতিক মোহ তাকে কখনই পরাস্ত করতে পারে না। আর এ অবস্থা পূর্ণ মারেফাত ছাড়া যে অর্জিত হতে পারে না- একথা স্পষ্ট। এমতাবস্থায় আমরা যখন কুরআন শরীফের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তখন এর মধ্যে প্রকাশ্যভাবে এমন সব উপকরণ দেখতে পাই যার মাধ্যমে খোদা তা'লার পূর্ণ মারেফাত লাভ করা সম্ভব। অতঃপর খোদার ভীতিতে নিমগ্ন হয়ে পাপ থেকে বিরত হওয়া সম্ভব। কারণ আমরা দেখেছি, এর শিক্ষা অনুসরণ করে খোদার বাক্যালাপ ও

বাণী লাভ হয়, ঐশী নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হয়, মানুষ খোদা থেকে অদৃশ্যের জ্ঞান লাভ করে খোদার সাথে তার একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপিত হয়, মানব-হৃদয় তাঁর মিলনের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে এবং মানুষ তাঁকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে প্রাধান্য দেয় এবং মানুষের প্রার্থনা গৃহীত হয়ে তাঁকে সে বিষয়ে অগ্রিম সংবাদ প্রদান করা হয়, তাঁর মধ্য থেকে মারেফাতের এক নদী প্রবাহিত হয় যা পাপ থেকে তাঁকে বিরত রাখে। অপরদিকে আমরা যখন ইঞ্জিলের প্রতি মনোনিবেশ করি, এর মধ্যে পাপ থেকে বিরত থাকার একটি অবান্তর পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করি– পাপ দূরীকরণের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। অদ্ভুত ব্যাপার! হযরত মসীহ্ (আ.) মানবিক দুর্বলতা দেখিয়েছেন অনেক, অন্যদের তুলনায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করতে পারে এমন কোন ঈশ্বরত্বের বিশেষ কোন শক্তিও তাঁর মাধ্যমে প্রদর্শিত হয় নি– তথাপি খ্রিষ্টানদের দৃষ্টিতে তিনি খোদা বলে স্বীকৃত!

এবার আমরা আর্য ধর্মের প্রতি সংক্ষিপ্তভাবে দৃষ্টিপাত করে দেখবো এদের ধর্মে পাপ থেকে মুক্তির কী ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, আর্য ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র বেদ গোড়াতেই ভবিষ্যতের জন্য খোদার বার্তা, বাণী ও ঐশী নিদর্শনাবলীর বিষয়টিই অস্বীকার করেছে। সুতরাং 'আনাল মওজুদ' (অর্থাৎ আমি সত্যিই বিদ্যমান) খোদার এই বাণীর পরিপূর্ণ তৃপ্তি অনুসন্ধান করা এবং খোদার পক্ষ থেকে প্রার্থনা গৃহীত হওয়া এবং প্রার্থনাকারীর ডাকে খোদা তা'লার সাড়া প্রদান, নিদর্শনাবলী প্রকাশের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ সরবরাহ– বেদে এসব বিষয়ে অনুসন্ধান করা একটি বৃথা চেষ্টা এবং নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। বরং এদের মতে, এসব কিছু অসম্ভব বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এটা স্পষ্ট, কোন কিছুর ভীতি বা ভালোবাসা– তার দর্শন এবং তার পূর্ণ মারেফাত লাভ ব্যতিরেকে সম্ভবই নয়। কেবল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করে পূর্ণ মারেফাত অর্জিত হতে পারে না। এ কারণেই কেবল মুক্তবুদ্ধির অনুসারীদের মধ্যে হাজার হাজার নাস্তিক ও নাস্তিক্যবাদীও রয়েছে। বরং যারা দর্শন-তত্ত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকেই পূর্ণ নাস্তিক বলা উচিত। আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, মানুষের নির্মল বিবেক-বিবেচনা যদি নাস্তিকতামুক্ত হয়, তবে, সৃষ্টিজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বেশির বেশি এ কথা বলতে পারে, এ সমস্ত জিনিসের একজন স্রষ্টা থাকা উচিত, কিন্তু এটা ঘোষণা করতে

পারে না, প্রকৃতপক্ষেই একজন স্রষ্টা আছেন। আবার এই মুক্ত-বুদ্ধিই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে মনে করতে পারে এসব কার্যক্রম নিজে নিজেই পরিচালিত এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই কতিপয় জিনিষ অপর কিছু বস্তুর স্রষ্টা। সুতরাং এককভাবে মুক্তবুদ্ধি আমাদের সেই স্তরে উপনীত করতে পারে না যাকে পূর্ণ মারেফাত বলা হয় এবং যা খোদা দর্শনেরই স্থলাভিষিক্ত একটি পর্যায়। এরই মাধ্যমে খোদা-ভীতি ও খোদা-প্রেম পূর্ণরূপে জন্ম নেয় এবং এই ভীতি ও ভালোবাসার আগুনে প্রত্যেক পাপ পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং মানুষের কামাবেগের মৃত্যু ঘটে এবং একটি জ্যোতির্ময় পরিবর্তন সাধিত হয়ে সমস্ত অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও পাপের পঙ্কিলতা দূরীভূত হয়। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের যেহেতু সেই পূর্ণ পবিত্রতা অর্জনের চিন্তা নেই যা পাপের কালিমা থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দান করে, এ কারণে বেশিরভাগ মানুষ এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এর সন্ধানে ব্যগ্র হয় না। বরং উল্টো শত্রুতাবশতঃ এর বিরোধিতা করে এবং সংঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। আর্য ধর্মাবলম্বীদের মতবাদ অতীব দুখঃজনক। কেননা, একদিকে মারেফাত লাভের প্রকৃত উপকরণ লাভ করা থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ, তার উপর যুক্তিভিত্তিক উপকরণের ক্ষেত্রেও তারা রিক্তহস্ত। কারণ, তাদের মতানুসারে জগতের প্রতিটি অণুকণা যখন অনাদি, নিজ সত্তায় বিদ্যমান, কারও দ্বারা সৃষ্ট নয়; আবার সমস্ত আত্মাও যেহেতু নিজ নিজ শক্তিসহ অনাদি, যাদের কোন স্রষ্টা নেই– তবে তাদের কাছে পরমেশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণই বা কি থাকলো? যদি বলা হয়, বিশ্বের অণু-পরমাণুকে একত্রিত করা এবং তাদের মধ্যে আত্মার সন্নিবেশ ঘটানো পরমেশ্বরের কাজ আর এটিই পরমেশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ– তবে এই ধারণা পোষণ করা ভুল হবে। কেননা, যখন আত্মা নিজেরাই এত শক্তিশালী যে আদি থেকে নিজেদের সত্তাকে এরা নিজেরাই পরস্পর সংযোজন এবং পৃথকীকরণের কাজটা করতে পারে না? ধূলিকণা অর্থাৎ অণু-পরমাণু নিজেদের সত্তা এবং পৃথকীকরণে অপরের মুখাপেক্ষী– একথা কেউ মানতে পারে না। এটা এমন একটি বিশ্বাস যা নাস্তিকতার জন্য একটি অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং এর কারণে একজন আর্যমতালম্বী অতি অল্প সময়ে নাস্তিকতা অবলম্বন করতে পারে এবং একজন চতুর নাস্তিক কথায় কথায় তাকে নিজের বশে আনতে পারে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং আমার মায়াও লাগে, কেননা আর্য মহাশয়রা শরীয়তের দু'অংশেই

সাংঘাতিক ভুল করেছেন। পরমেশ্বর সম্বন্ধে এ কেমন বিশ্বাস যে, তিনি সমস্ত সৃষ্ট জিনিষের উৎস নন এবং তিনি যাবতীয় কল্যাণের উৎসও নন? বরং অণু-পরমাণু নিজেদের যাবতীয় শক্তিসহ আদি থেকে নিজে নিজেই বিদ্যমান এবং এদের প্রকৃতি খোদার পূর্ণ প্রভাব ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত! এখন নিজেরাই চিন্তা করে দেখুন, এমতাবস্থায় পরমেশ্বরের প্রয়োজনটা কিসের আর উপাসনার যোগ্যই বা কেন? কেন তাকে সর্বশক্তিমান বলা হয়? কেমন করে আর কীভাবে তাঁর পরিচয় আবিস্কৃত হয়েছে কেউ কি এর উত্তর দিতে পারবেন? হায় যদি কেউ আমাদের সহানুভুতি উপলব্ধি করতে পারতো! হায় যদি কেউ নীরবে নিভৃতে বসে এসব ব্যাপার চিন্তা করে দেখতো! হে সর্বশক্তিমান খোদা! আমাদের প্রাচীন প্রতিবেশী এই জাতির প্রতিও তুমি সদয় হও। এদের অনেকের অন্তরকে তুমি সত্যের প্রতি আকৃষ্ট কর। কেননা, তুমি সর্বশক্তির অধিকারী (আমীন)।

এটা ছিল পরমেশ্বর সম্পর্কিত দিক যার মাধ্যমে সেই অতুলনীয় স্রষ্টার অধিকার খর্ব করা হয়েছে। আর্য মতাবলম্বীদের পরিবেশিত দ্বিতীয় আঙ্গিকটি সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। এর একটি দিক হলো 'জন্মান্তরবাদ' অর্থাৎ বিভিন্ন যোনীতে প্রবিষ্ট হয়ে আত্মার বারে বারে পৃথিবীতে পুনরাগমন। এই বিশ্বাসের সবচাইতে অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক দিকটি হলো, বুদ্ধি-বিবেকের দাবিদার হয়েও এক্ষেত্রে মনে করা হয়, পরমেশ্বর এতটা পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী–একটি পাপের বিনিময়ে তিনি কোটি কোটি বরং হাজার হাজার কোটি বছর ধরে শাস্তি প্রদান করে থাকেন! অথচ তিনি জানেন এরা তাঁর সৃষ্ট নয়! বার বার ভিন্ন যোনীতে প্রেরণ করে কষ্ট দেয়া ছাড়া এদের উপর তাঁর অন্য কোন অধিকারও বর্তায় না। তবে কেন তিনি মানব গঠিত সরকারের ন্যায় মাত্র কয়েক বছরের শাস্তি প্রদান করেন না? একথা স্পষ্ট, দীর্ঘ শাস্তি প্রদানের জন্য শাস্তিপ্রাপ্তদের উপর দীর্ঘস্থায়ী অধিকারও থাকা প্রয়োজন। কিন্তু যখন সমস্ত অণু-পরমাণু আর আত্মা নিজ নিজ সত্ত্বায় বিদ্যমান এবং এদের ভিন্ন ভিন্ন দেহে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রবিষ্ট করা ছাড়া এদের উপর তার মোটেও কোন অনুগ্রহ নেই– তবে তিনি কোন্ অধিকার বলে দীর্ঘস্থায়ী শাস্তি প্রদান করেন? দ্যাখো, ইসলাম ধর্মে খোদার দাবি হলো, 'আমিই প্রত্যেক অণু এবং আত্মার স্রষ্টা এবং এদের সমস্ত শক্তি আমারই

কল্যাণপ্রসূত এবং এরা আমারই দ্বারা সৃষ্ট এবং আমারই সাহায্যে এরা জীবন ধারণ করে'– তথাপি তিনি পবিত্র কুরআনে বলেন :

إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٨﴾

'ইল্লা মাশাআ রাব্বুকা; ইন্না রাব্বাকা ফা'আলুল লিমা ইউরীদ' (সূরা হুদ: ১০৮)।

অর্থাৎ জাহান্নামীরা নরকে চিরকাল থাকবে। এই চিরত্ব খোদার চিরত্ব নয় বরং এস্থলে 'চিরকাল' এক দীর্ঘ যুগ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অবশেষে খোদার করুণা আধিপত্য প্রদর্শন করবে। কেননা, তিনি সর্বশক্তিমান, যা চান তা-ই করেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় নেতা ও অভিভাবক নবী করীম (সা.)-এর একটি হাদীস রয়েছে আর সেটি হ'লো :

ياتي على جهنّم زمان ليس فيها أحدٌ و تسبم الصبا تحرّك أبوابها

"ইয়াতি আলা জাহান্নামা যামানুন লায়সা ফীহা আহাদুন ওয়া নাসীমুস সাবা তুহারিরকু আবওয়াবাহা'।

অর্থাৎ, নরকে এমন একটি সময়ও আসন্ন যখন এর মধ্যে কেউ থাকবে না এবং ভোরের বাতাস এর দরজাগুলিকে নাড়া দিয়ে যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এসব জাতি খোদাকে এমন খিটখিটে মেজাজসম্পন্ন আর হিংসাপরায়ণ সাব্যস্ত করে থাকে, যার রাগ কখনই প্রশমিত হয় না এবং তিনি অসংখ্য কোটি জন্মেও পাপ ক্ষমা করেন না। এই অভিযোগ কেবল আর্যমহাশয়দের বিরুদ্ধেই নয় বরং খ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী তারাও একটি পাপের প্রায়শ্চিত্তে চিরস্থায়ী এক নরক প্রস্তাব করে যার কোন অন্ত নেই। সেই সাথে তারা একথাও বিশ্বাস করে, খোদা তা'লা প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা। সুতরাং, খোদা যখন আত্মা এবং এর যাবতীয় শক্তির সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি নিজেই কিছু স্বভাবের মাঝে এমন দুর্বলতা সৃষ্টি করেছেন যার কারণে তাদের দ্বারা পাপ সংঘটিত হয় এবং মানুষ একটি ঘড়ির মত কেবল সেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতে পারে যা প্রকৃত ঘড়ি-নির্মাতা তার জন্য নির্ধারণ করেছেন– তাই তারা খানিকটা দয়া প্রাপ্তির যোগ্যতা অবশ্যই রাখে। কেননা,

অপরাধ ও দুর্বলতার দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তাদের একক নয় বরং এতে সৃষ্টিকর্তারও অনেকখানি অবদান রয়েছে যিনি তাদেরকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। এটা কি ধরনের বিচার– নিজের ছেলের শাস্তির বেলায় তিনি কেবল তিন দিন ধার্য করেছেন কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে এমন সীমাহীন শাস্তির স্থায়ী আদেশ দিয়েছেন যার কোন শেষ নেই! তিনি চান তারা যেন চিরকাল নরকের অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হয়। এমনটা করা কি পরম করুণাময় ও দয়াপরবশ খোদার সাজে? বরং তাঁর নিজের ছেলেকে বেশি শাস্তি দেয়া উচিত ছিল। কেননা, ঐশ্বরিক গুণাবলীর কারণে সেই তো বেশি শাস্তি সহ্য করতে পারতো-হাজার হোক, সে যে ঈশ্বর-পুত্র! অসহায়, দুর্বল মানুষদের শক্তি কি কখনও ঈশ্বর–পুত্রের শক্তির সমকক্ষ হতে পারে? মোট কথা, খ্রিষ্টান ও আর্য মহাশয়রা একই আপত্তির সম্মুখীন এবং তাদের সঙ্গে কিছু স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানরাও। কিন্তু মুসলমানদের ভ্রান্তির পেছনে খোদার বাণীর কোন দোষ নেই। আল্লাহ্ তা'লা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, এটা তাদের নিজেদের দোষ। তাদের দোষ হলো, তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে এখনও জীবিত আখ্যা দেয় এবং তাঁকে দ্বিতীয় আকাশে বসিয়ে রেখেছে। অথচ খোদার বাণী কুরআন শরীফে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, এক দীর্ঘ যুগ পূর্বে হযরত ঈসা (আ.) গত হয়ে গেছেন এবং বিগত আত্মাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। কিন্তু এরা খোদার ঐশীগ্রন্থের বিরুদ্ধে, তাঁর দ্বিতীয় আগমনের প্রতীক্ষায় রত!

আমি পুনরায় মুল বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে বলছি, 'জন্মান্তরবাদের' অসারতার দ্বিতীয় দিকটি হলো, এই পদ্ধতিটি সত্যিকার পবিত্রতা অর্জনের বিরোধী। আমরা যখন প্রতিদিন কারও মা, কারও বোন এবং কারও নাতনীকে মৃত্যুবরণ করতে দেখছি, তাহলে এ প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসীরা যে বেদ অনুসারে নিষিদ্ধ এমন কোন স্থানে ভুলবশতঃ বিয়ে করে বসবে না–এর নিশ্চয়তা কোথায়? হ্যাঁ, জন্মকালে প্রত্যেক শিশুর সংগে যদি একটি তালিকা সংযুক্ত থাকে যাতে লেখা থাকবে– এ ব্যক্তি অমুক জন্মে অমুক ব্যক্তির সন্তান ছিল– এমতাবস্থায় অবৈধ বিয়ে থেকে বিরত থাকা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু পরমেশ্বর এমনটি করেন নি, তিনি যেন স্বেচ্ছায় এই অবৈধ পদ্ধতিকে বিস্তৃতি দান করতে চেয়েছেন!

এছাড়া আমরা কিছুতেই বুঝতে পারি না, পুনর্জন্মের ঝামেলায় পড়ে লাভটা কি? যখন 'নাজাত' কিংবা মুক্তি সম্পূর্ণভাবে ঐশী জ্ঞান অর্থাৎ

'মারেফাতে ইলাহী'র উপর নির্ভরশীল তখন দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণকারী শিশুর জ্ঞান তার দ্বিতীয় জন্মে নিঃশেষ হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু বাস্তবে একটি শিশু যখন জন্ম নেয় তখন একদম নিঃস্ব অবস্থায় পৃথিবীতে আসে এবং এক ভবঘুরে অপব্যয়কারীর মত নিজের অর্জিত ভাণ্ডার নিঃশেষ করে দরিদ্র এবং নিঃসম্বল সেজে বসে। পূর্বজন্মে সে হাজার বার 'বেদ' পাঠ করে থাকলেও নতুন জন্মে এর এক পৃষ্ঠাও তার মনে থাকে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্জন্মবাদ পক্রিয়ায় মুক্তির কোন উপায় দেখা যায় না। কেননা অনন্ত ক্লেশ ও কষ্টে অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার নতুন জন্মের সাথে সাথে নিঃশেষ হতে থাকে। জ্ঞানও কখনো সঞ্চিত হবে না আর মুক্তিও কখনো লাভ হবে না! আর্য সমাজীদের নীতি অনুসারে প্রথমতঃ 'মুক্তি'ই ছিল সীমাবদ্ধ একটি কালের জন্য, তার উপর আবার মুক্তি লাভের মুলধন অর্থাৎ জ্ঞান সঞ্চিত হতে না পারার বিপত্তি! এটা আত্মার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি?

আর্য ধর্মমতে মানব পবিত্রতা বিরোধী দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে 'নিয়োগ'। আমি এ বিষয়টি বেদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিশ্বাস করি না বরং এ বিষয়কে বেদের প্রতি আরোপ করার চিন্তা করলেও হৃদয় শিউরে উঠে। আমার বুদ্ধি-বিবেকের বিবেচনায় আমি বিশ্বাস করি, এক ব্যক্তি তার সতী-সাধ্বি স্ত্রীকে, যার নিজস্ব বংশ ও সম্মান বিদ্যমান, যার সাথে তার দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত এবং যে তার স্ত্রীরূপে পরিচিত– কেবল সন্তান লাভের জন্য পরপুরুষের সাথে সহবাস করাবে– এটা মানবস্বভাব কখনই গ্রহণ করতে পারে না এবং আমি এটাও পছন্দ করি না যে, কোন স্ত্রী তার স্বামী জীবিত থাকা সত্ত্বেও নিজে এমন কুকাজ করুক। মানুষ তো দূরের কথা! কোন কোন জীবজন্তুর মধ্যেও এই লজ্জাবোধ ও আত্মাভিমান পাওয়া যায়– তারা নিজের সঙ্গীনী সম্পর্কে এমনটি সহ্য করে না। আমি এ পর্যায়ে কোন তর্ক করতে চাই না, কেবল আর্য মহাশয়দের কাছে বিনীত আবেদন করবো, তারা যদি এ বিশ্বাসটি ত্যাগ করেন তবে বড়ই উত্তম কাজ হবে। আগেই এ দেশ পবিত্রতার প্রকৃত স্তর থেকে অনেক নিচে নেমে গেছে, তার উপর, এ ধরনের ব্যাপার যদি পুরুষ এবং নারীদের মধ্যে আরম্ভ হয়ে যায় তবে এ দেশের পরিণাম যে কি দাঁড়াবে তা বলা দুস্কর।

একই সাথে আরেকটি বিষয় নিবেদন করার সাহস করবো। এ যুগে মুসলমানদের সাথে আর্য সমাজীদের যতই মতবিরোধ থাকুক এবং মুসলমানদের ধর্মমত সম্বন্ধে তাদের মনে যতই বিদ্বেষ থাকুক না কেন, খোদার দোহাই! পর্দা প্রথাকে সম্পূর্ণভাবে বিদায় দিবেন না। এতে এমন অনেক ক্ষতি রয়েছে যা পরে পরিদৃষ্ট হবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই বুঝেন, মানব সমাজের একটি বড় অংশ রিপুর তাড়নার (নফসে আম্মারাহ্) অধীনে চলছে এবং তারা এর দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত যে, আবেগ উচ্ছাসের বেলায় খোদার শাস্তির কথা একেবারেই চিন্তা করে না। রূপসী যুবতী মেয়েদের দেখে তারা কামলোলুপ দৃষ্টিপাত থেকে ক্ষান্ত হয় না। অনরূপভাবে, অনেক মেয়েও মন্দ দৃষ্টিতে পরপুরুষদের দেখে থাকে। এই মন্দ অবস্থা সত্ত্বেও যদি উভয় পক্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয় তবে নিঃসন্দেহে তাদের পরিণাম তা-ই হবে যা আজকাল ইউরোপের কোন কোন অংশে প্রকাশ পাচ্ছে। হ্যাঁ, যখন এরা সত্যি সত্যিই পবিত্র-চিত্ত হয়ে যাবে, এদের নাফসে আম্মারাহ নিঃশেষ হয়ে শয়তানী আত্মা বের হয়ে যাবে, তাদের চোখে যখন খোদা-ভীতি বিকশিত হবে, তাদের মনে খোদার শ্রেষ্ঠত্ব স্থান লাভ করবে, তারা নিজ সত্তায় যখন এক পবিত্র পরিবর্তন সাধন করবে এবং খোদা-ভীতির একটি পবিত্র পোশাক পরিধান করবে, তখন এরা যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারে। কেননা এমতাবস্থায় এরা খোদার হাতে তৈরী নপুংশক হবে, যেন এরা পুরুষই নয়। তখন তাদের চোখ পরস্ত্রীর প্রতি কামলোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপে অক্ষম হবে। তারা তখন মনে এমন কথা চিন্তাও করতে পারবে না। কিন্তু হে আমার প্রিয়গণ! খোদা নিজে তোমাদের মনে বাণী অবতীর্ণ করুন– এমনটা করার সময় এখনও হয় নি। আর যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তোমরা জাতির মধ্যে একটি বিষাক্ত বীজ বপনকারী সাব্যস্ত হবে। এটা এমন বিপদসংকুল এক যুগ যে, যদি অন্য কোন যুগে পর্দা প্রথা নাও বা থেকে থাকে তথাপি এ যুগে অবশ্যই তা থাকা উচিত। কেননা, এটা 'কালো যুগ' এবং পৃথিবীতে দুর্নীতি, অবাধ্যতা, অশীলতা ও মদ্যপানের প্রকোপ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছে। মানব হৃদয়ে নাস্তিকতার ধ্যান-ধারণা প্রসার লাভ করছে এবং অন্তরে খোদার আদেশসমূহের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রায় লুপ্ত। মুখে সব কিছু বলা হয় এবং বক্তৃতাগুলিও যুক্তি আর দর্শনপূর্ণ,

কিন্তু হৃদয় আধ্যাত্মিকতা বিবর্জিত। এমতাবস্থায় নিজেদের অসহায় ছাগলগুলোকে নেকড়ে বাঘের জঙ্গলে ছেড়ে দেয়াটা কি সমীচীন হবে?

বন্ধুগণ! এখন পেগের মহামারি আমাদের দ্বার প্রান্তে উপস্থিত এবং খোদা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানানুসারে এখনও এর বহুলাংশ প্রকাশিত হওয়া বাকি। এগুলো বড়ই ভয়ানক দিন। কে জানে আগামী মে মাস পর্যন্ত আমাদের মাঝে কে জীবিত থাকবে আর কে মারা যাবে, কোন বাড়িতে দুর্যোগ নেমে আসবে এবং কোনটি নিরাপদ থাকবে! সুতরাং সজাগ হও আর অনুতাপ কর এবং পুণ্যকর্ম দ্বারা নিজের মালিককে সন্তুষ্ট কর। মনে রেখো, ধর্ম-বিশ্বাস সংক্রান্ত ভুলভ্রান্তির শাস্তি মৃত্যুর পর দেয়া হবে এবং হিন্দু, খ্রিষ্টান কিংবা মুসলমান হবার মীমাংসা কিয়ামতের দিনই হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অত্যাচার, অনাচার এবং অশীল কুকর্মে সীমালঙ্ঘন করে, তাকে এখানেই শাস্তি প্রদান করা হয়। কোনক্রমেই সে তখন খোদার শাস্তি থেকে পালাতে পারে না। সুতরাং নিজের খোদাকে অবিলম্বে সন্তুষ্ট কর এবং সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলির আগমনের পূর্বে অর্থাৎ প্লেগের আক্রমণের আগেই তোমরা খোদার সাথে সন্ধি কর– যার সংবাদ নবীরা দিয়ে গেছেন। তিনি অতীব দয়ালু। অশ্রুসিক্ত হয়ে এক মুহূর্তের হৃদয় নিংড়ানো অনুতাপে খোদা সত্তর বছরের পাপ ক্ষমা করতে পারেন। অনুতাপ গৃহীত হয় না– একথা বলো না। মনে রেখো, তোমরা তোমাদের কর্মের দরুণ রক্ষা পেতে পারো না। মানবের কর্ম নয় খোদার অনুগ্রহই সবসময়ে রক্ষা করে। হে পরম করুণাময়, দয়াপরবশ খোদা আমাদের সকলের প্রতি সদয় হও। কেননা আমরা তোমার দাস এবং তোমারই দরবারে বিনত হয়েছি (আমীন)।

বক্তৃতার দ্বিতীয় অংশ

সম্মানীত শ্রোতামণ্ডলী! এবার আমি এই দেশে উপস্থাপিত আমার একটি দাবি সম্বন্ধে আপনাদের সমীপে কিছু বলবো। বুদ্ধি-বিবেচনা ও অভিজ্ঞতার আলোকে একথা সাব্যস্ত, পৃথিবীতে যখন পাপের অন্ধকার ছেয়ে যায়, জগতে সর্বপ্রকার অন্যায় ও দুষ্কর্ম যখন ছড়িয়ে পড়ে, আধ্যাত্মিকতা হ্রাস পায়, যখন ভূপৃষ্ঠ পাপের আধিক্যে অপবিত্র হয়ে যায় আর খোদা তা'লার প্রতি ভালোবাসা শিথিল হয়ে পৃথিবীতে এক ধরনের বিষাক্ত বাতাস বইতে থাকে, তখন আল্লাহ্‌র কৃপা জগতকে পুনরায় জীবিত করতে উদ্যত হয়। আপনারা জাগতিক আবহাওয়ার চিরাচরিত পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করে থাকেন। এক পর্যায়ে হেমন্তকাল আগমন করে। এ সময় গাছের ফুল, ফল আর পাতার উপর এক দুর্যোগ নেমে আসে। গাছগুলো দেখতে এত বিশ্রী দেখায় যেন এক ব্যক্তি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে, তার মাঝে রক্তের চিহ্ন থাকে না আর তার মুখমণ্ডলে মৃতবৎ ব্যক্তির লক্ষণ প্রকাশিত হয়, কিংবা দেখলে মনে হয় একজন কুষ্ঠ রোগীর রোগ এমন চরম আকার ধারণ করেছে যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খসে পড়ছে। আবার গাছপালার উপর দ্বিতীয় আরেকটি ঋতু আগমন করে, যাকে বসন্তকাল বলে। এই ঋতুতে বৃক্ষরাজি এক ভিন্ন রূপ ধারণ করে আর ফল, ফুল এবং ঘন সবুজ পাতা প্রস্ফুটিত হয়। মানবজাতির অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। এদের উপরও 'অন্ধকার' ও 'আলো' এই দুই যুগ পালাক্রমে আগমন করে। এক শতাব্দীতে এরা হেমন্তকালের মত মানবোৎকর্ষের সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে আবার আরেক যুগে আকাশ থেকে এদের উপর এমন স্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহিত হয় যার ফলে এদের হৃদয়ে বসন্তের উন্মেষ ঘটে। পৃথিবী সৃষ্টি অবধি এই দু'টি ঋতুই মানবজাতির জন্য অবধারিত রয়েছে। তদুনযায়ী, আমরা যে যুগে বাস করছি এটা হলো বসন্তের সূচনাকাল। পাঞ্জাবে হেমন্তকাল তখন তার চরমে উপনীত হয়েছিল যখন দেশে খালসা জাতি (শিখ) রাজত্ব করছিল। কেননা জ্ঞান চর্চা ছিল না, দেশে অজ্ঞতা বিস্তৃতি লাভ করেছিল আর ধর্মীয় পুস্তকাদি এমনভাবে বিলুপ্ত হয়েছিল যে, খুঁজলে হয়তবা কোন এক অভিজাত পরিবারের কাছে পাওয়া যেত। এরপর ইংরেজ সরকারের যুগ এল। এই যুগ অতীব শান্তিপূর্ণ। সত্য বলতে কি, শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে খালসা রাজত্বের দিনগুলিকে আমরা যদি ইংরেজ রাজত্বকালের রাতের সাথেও তুলনা করি তবুও এটা যুলুম ও বাস্তবতা বিরোধী হবে। এই যুগ আধ্যাত্মিক ও পার্থিব কল্যাণরাজির

সমন্বিতরূপ। আর পরবর্তীতে আসন্ন প্রাচুর্য ও কল্যাণ বসন্তের এই সূচনালগ্নেই অনুমেয়। তবে, বর্তমান যুগটি কয়েক মাথা বিশিষ্ট অদ্ভুত এক জন্তুর মত। এর কতিপয় মুখ বড়ই আশিসমণ্ডিত ও সত্যের সমর্থক। এতে সন্দেহ নেই, ইংরেজ সরকার এদেশে বিভিন্ন ও বিবিধ প্রকার জ্ঞান-বিদ্যার উন্নয়ন সাধন করেছে, সেই সাথে বই-পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনার এমন সব সহজ ও সোজা পন্থা বেরিয়েছে অতীতে যার কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এদেশে হাজার হাজার সংখ্যায় যে সব পুস্তকালয় লুকায়িত ছিল সেগুলোও উন্মোচিত হয়েছে। আর অল্প ক'দিনের মধ্যে যুগ জ্ঞান-বিদ্যার ক্ষেত্রে এত অগ্রসর হয়েছে, মনে হয় যেন এক নতুন জাতি জন্ম নিয়েছে। এসব কিছু ঘটেছে ঠিকই কিন্তু মানুষের আচার-আচরণ দিন দিন নষ্ট হয়ে চলেছে আর ভেতরে ভেতরে নাস্তিকতার চারাগাছ বৃদ্ধি লাভ করেছে। ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহে কোন প্রকার সন্দেহ নেই, এরা জনগণের এত উপকার সাধন করেছে, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং বিভিন্ন স্থানে শান্তি স্থাপন করেছে– অন্য কোন সরকারের ক্ষেত্রে এর উদাহরণ অনুসন্ধান করাটা হবে নিছক একটি ব্যর্থ-প্রয়াস। কিন্তু শান্তির পরিধি পূর্ণাকারে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে জনগণকে যে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে তা বেশিরভাগ মানুষ সঠিকভাবে আত্মস্থ করতে পারে নি। আর এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'লা এবং এই সরকারের প্রতি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল তদ্স্থলে মানবহৃদয়ে শৈথিল্য, পার্থিব-আসক্তি, লোভ-লালসা আর উদাসীনতা এত বেশি বেড়ে গেছে যেন পৃথিবীটাকেই আমাদের চিরন্তন আবাসস্থল ধরে নেয়া হয়েছে। আমাদের প্রতি যেন কারও কোন অনুগ্রহও নেই আর আমাদের উপর কারও যেন কর্তৃত্বও নেই! আর জগতের রীতি হলো– শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের যুগেই বেশিরভাগ পাপের জন্ম হয়। এই প্রাকৃতিক নিয়মে এ যুগেও পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করেছে। তদনুসারে, হৃদয়ের কাঠিন্য ও শৈথিল্যের কারণে এদেশের বর্তমান অবস্থা অতীব ভয়াবহরূপ ধারণ করেছে। অসভ্য-বন্যদের সাথে তুলনীয় অজ্ঞ ও দুষ্ট লোকেরা লজ্জাকর সব অপরাধ যেমন, সিঁদ কাটা, ব্যভিচার এবং অন্যায় হত্যাকাণ্ড– এ ধরনের মারাত্মক অপরাধে মগ্ন। আর অন্যরা নিজ নিজ স্বভাব ও রিপু তাড়িত হয়ে বিভিন্ন প্রকার অন্যায় পাপাচারে লিপ্ত। তাই পানশালাগুলো অন্যান্য দোকানের তুলনায় অধিক লোকারণ্য বলে মনে হয়, অন্যান্য কুকর্ম ও অশীলতার পেশাও দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করে চলেছে। উপসনালয়গুলো যেন কেবল রীতি ও প্রথা পালনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। মোট কথা, পৃথিবীতে পাপের একটি ভয়াবহ তাণ্ডব চলছে আর

শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও পূর্ণ সুযোগ-সুবিধার কারণে বেশিরভাগ মানুষের রিপুর তাড়নায় এত প্রাবল্যের সৃষ্টি হয়েছে, যেন এ খরস্রোতা নদীর বাঁধ ভেঙ্গে এক রাতেই চতুর্দিকের সমস্ত গ্রামকে ধ্বংস করে ফেলছে। পৃথিবীতে যে এক চরম অন্ধকারের সৃষ্টি হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই এবং সেই লগ্ন এসে উপস্থিত হয়েছে যখন– হয় খোদা তা'লা জগতে নতুন এক আলো সৃষ্টি করবেন কিংবা এ জগতকে ধ্বংস করে দিবেন। কিন্তু এ জগত ধ্বংস হতে এখনও এক হাজার বছর অবশিষ্ট আছে। পার্থিব সৌন্দর্য, স্বাচ্ছন্দ্য আর সুখের জন্য যেসব নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টি হয়েছে– এই পরিবর্তনও পরিষ্কার সাব্যস্ত করছে, আল্লাহ্ তা'লা যেরূপ জাগতিক সংশোধনের ব্যবস্থা করেছেন সেরূপ তিনি আধ্যাত্মিকভাবেও মানুষের আত্মশুদ্ধি ও উন্নতি চান। কেননা, মানুষের জাগতিক অবস্থার চেয়ে আধ্যাত্মিক অবস্থার অনেক বেশি অধঃপতন হয়েছে এবং তা এমন এক মারাত্মক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যখন মানবজাতি আল্লাহ্‌র ক্রোধের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হতে পারে। সর্বপ্রকার পাপের উদ্দীপনাকে তার চরমত্বে লক্ষ্য করা যাচ্ছে আর আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ অতীব দুর্বল হয়ে পড়েছে আর ঈমানের জ্যোতি নিভে গেছে। এখন এই অন্ধকারের প্রাবল্যের যুগে যে আকাশ থেকে এক জ্যোতি সৃষ্টি হওয়া উচিত– স্বচ্ছ বিবেক এর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে স্বীকার করে। কেননা পৃথিবীর অন্ধকার দূরীকরণের বিষয়টি আদি থেকে জগতে ঐশী আলো অবতীর্ণ হবার সাথে সম্পৃক্ত। তদ্রূপ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও এই জ্যোতি আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয় এবং মানব হৃদয়কে আলোকিত করে।

যখন থেকে খোদা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন– প্রাকৃতিক নিয়মে এ কথাই পরিলক্ষিত হয়েছে, তিনি মানুষের মাঝে এক ঐক্য সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রয়োজনের সময় তাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির প্রতি তাঁর পূর্ণ মারেফাতের জ্যোতি অবতীর্ণ করেন, তাঁকে নিজ বাণী ও বাক্যালাপ দ্বারা ভূষিত করেন। নিজের পূর্ণপ্রেমের সুরা তাঁকে পান করান আর নিজ মনোনীত পথের সম্যক জ্ঞান তাঁকে প্রদান করেন। আর তাঁর হৃদয়ে এমন এক শক্তিশালী আবেগ সৃষ্টি করেন যেন সে অন্যদেরও সেই জ্যোতি, আধ্যাত্মিক জ্ঞান আর ঐশী প্রেমের দিকে আকর্ষণ করে যা তাঁকে প্রদান করা হয়েছে। এ পক্রিয়ায় অন্যান্য মানুষ তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে তাঁরই সত্তার অংশরূপে পরিগণ্য হয়ে, তাঁর মারেফাতের ভাগী হয়ে পাপ থেকে বিরত থাকে আর তাকওয়া ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে। এই আদি নিয়ম অনুযায়ী, খোদা তা'লা তাঁর পবিত্র নবীদের মাধ্যমে সংবাদ দিয়েছেন যে, আদম (আ.)-এর যুগ থেকে গণনা করে

যখন ছয় হাজার বছর শেষ পর্যায়ে উপনীত হবে তখন ভূপৃষ্ঠে বড় অন্ধকার বিস্তৃতি লাভ করবে আর পাপের বন্যা তীব্র গতিতে বয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র ভালোবাসা যখন মানব হৃদয়ে অনেক হ্রাস পাবে বরং নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ তা'লা কোন প্রকার জাগতিক উপকরণ ছাড়া কেবল ঐশী পন্থায় আধ্যাত্মিকভাবে আদমের অনুরূপ এক ব্যক্তির মাঝে সত্য, প্রেম ও মারেফাতের রূহ ফুৎকার করবেন। তাকে মসীহ্ও বলা হবে কেননা খোদা তা'লা স্বহস্তে তাঁর আত্মায় নিজস্ব ভালোবাসার সুগন্ধি মাখিয়ে দেবেন। আর সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ যাকে আরেকভাবে খোদার ঐশী গ্রন্থসমূহে মসীহ্ মাওউদও বলা হয়েছে– তাঁকে শয়তানের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হবে। আর শয়তানী বাহিনী এবং মসীহ্‌র মাঝে এটাই শেষ যুদ্ধ হবে। সেদিন শয়তান তার সমস্ত শক্তিসহ, সব বংশধরসহ, সর্বপ্রকার পরিকল্পনাসহ এই আধ্যাত্মিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসবে। ভালো এবং মন্দের মাঝে পৃথিবীতে এমন যুদ্ধ কখনও হয় নি যেমনটি সেদিন হবে। কেননা, সেদিন শয়তানের ষড়যন্ত্র আর শয়তানী জ্ঞান-গবেষণা উন্নতির চরম শীর্ষে উপনীত হবে। যত পন্থায় শয়তান মানুষকে বিপথগামী করতে পারে সেই সব পদ্ধতি সেদিন সহজলভ্য হবে। তখন প্রচণ্ড এক যুদ্ধের পর যা প্রকৃতপক্ষে একটি আধ্যাত্মিক যুদ্ধ- খোদার মসীহ্ বিজয় লাভ করবেন আর শয়তানী শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে আর এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত খোদার মাহাত্ম্য, মহিমা, পবিত্রতা ও একত্ববাদ পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে। সেই যুগ পূর্ণ হাজার বছরের হবে যাকে 'সপ্তম দিবস'ও বলা হয়। এরপর পৃথিবীর সমাপ্তি ঘটবে। অতএব, আমিই সেই মসীহ্– যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করুক। এস্থলে, শয়তানের অস্তিত্বকে অস্বীকারকারী কতিপয় সম্প্রদায় আশ্চর্য হবে, শয়তান আবার কী জিনিস? সুতরাং তাদের স্মরণ রাখা উচিত, মানুষের মনে সব সময় দু'ধরনের আকর্ষণ পালাক্রমে সংযুক্ত থাকে– একটি মঙ্গলের প্রতি আকর্ষণ, অপরটি মন্দের প্রতি। মঙ্গলের প্রতি যে আকর্ষণ একে ইসলামী শরীয়ত ফিরিশতাদের প্রতি আরোপ করে থাকে। আর মন্দের প্রতি যে আকর্ষণ একে ইসলামী শরীয়ত শয়তানের প্রতি আরোপ করে। এর উদ্দেশ্য কেবল এটুকু, মানব স্বভাবে দু'টি আকর্ষণ বিদ্যমান। মানুষ কখনও পুণ্যের দিকে আকৃষ্ট হয় আবার কখনও পাপের দিকে।

আমার মনে হয়, এই জনসভায় এমন অনেক লোকও আছেন যারা আমার প্রতিশ্রুত মসীহ্ হবার দাবি আর খোদা তা'লার সাথে কথোপকথন ও ঐশী-বাণী লাভের বক্তব্যকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছেন আর আমাকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে অবলোকন করছেন। আমি কিন্তু তাদের অপারগ বলে মনে

করি। কেননা, আদি থেকে এমনই হয়ে এসেছে। খোদার প্রত্যাদিষ্ট এবং প্রেরিত ব্যক্তিদের প্রথমে কষ্টদায়ক কথা শুনতেই হয়। নবী কেবল তাঁর প্রারম্ভিক যুগেই অপমানিত হয়ে থাকেন। সেই নবী, রসূল, কিতাবধারী আর শরীয়তবাহক মহাপুরুষ (সা.)– যাঁর উম্মত আখ্যায়িত হয়ে আমরা সবাই গর্বিত, যাঁর শরীয়তের মাধ্যমে অন্যান্য সব শরীয়তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তাঁর জীবনীর প্রতি লক্ষ্য করে দেখো, কীভাবে তের বছর পর্যন্ত মক্কায় একাকী দৈন্য ও অসহায় অবস্থায় অস্বীকারকারীদের হাতে কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছেন! কীভাবে তিনি তাচ্ছিল্য ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছেন আর শেষ পর্যন্ত চরম অত্যাচার ও নিপীড়নের কারণে কীভাবে মক্কা থেকে বিতাড়িত হলেন! কে জানতো শেষ পর্যন্ত তিনি কোটি কোটি মানুষের ইমাম এবং পথ-প্রদর্শকে পরিণত হবেন? সুতরাং আল্লাহ্‌র নিয়ম এটাই, আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তিদের প্রথম প্রথম তুচ্ছ ও অপমানিত গণ্য করা হয়। খোদা তা'লার প্রেরিত ব্যক্তিদেরকে সনাক্তকারী লোকদের সংখ্যা প্রাথমিক পর্যায়ে কম হয়ে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা মানুষের হৃদয় প্রেরিতদেরকে গ্রহণ করার জন্য উন্মুক্ত না করেন ততক্ষণ অজ্ঞ ব্যক্তিদের হাতে কষ্ট ভোগ করা এবং তাঁদের সম্বন্ধে বিভিন্ন কটুকথা ছড়ানো, তাঁদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং তাদেরকে গালি দেয়া একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়। এতো গেল আমার দাবির কথা যা আমি ব্যক্ত করলাম। কিন্তু যে কাজের জন্য আমি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি তা হলো, আমি যেন খোদা এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে পঙ্কিলতার সৃষ্টি হয়েছে– একে দূরীভূত করে ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার সম্পর্ক স্থাপন করি এবং সত্যের প্রকাশ দ্বারা ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করি। যেসব ধর্মীয় সত্য দৃষ্টির আড়ালে বিলুপ্ত সেগুলোকে যেন পুনঃপ্রকাশ করি এবং কুপ্রবৃত্তির তলে চাপা পড়া আধ্যাত্মিকতাকে আমি যেন জগতে উপস্থাপন করি। খোদার শক্তি যা তাঁর প্রতি মনোনিবেশ অথবা প্রার্থনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হয় একে কেবল কথায় নয় বরং বাস্তবরূপে এর অবস্থা আমি যেন বর্ণনা করি। সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ কাজ হলো, সর্বপ্রকার শির্‌কের মিশ্রণমুক্ত ও জ্যোতির্ময় একত্ববাদ যা আজ বিলুপ্ত, আমি যেন পুনরায় এই জাতিতে এর বীজ বপন করি। আর এসব কাজ আমার শক্তি দ্বারা নয় বরং সেই খোদা তা'লার শক্তি দ্বারা সম্পাদিত হবে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর খোদা।

আমি লক্ষ্য করছি, একদিকে নিজ হাতে খোদা আমাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আমাকে তাঁর ঐশীবাণী দ্বারা ভূষিত করে আমার হৃদয়কে এ ধরনের

সংশোধনকল্পে আত্মনিয়োগ করার উদ্যম প্রদান করেছেন, অন্যদিকে তিনি মানুষের মাঝে এমন হৃদয়ও সৃষ্টি করেছেন যারা আমার কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। আমি প্রত্যক্ষ করছি, যখন থেকে খোদা আমাকে পৃথিবীতে প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন তখন থেকে জগতে এক বিরাট বিপব সাধিত হয়ে চলেছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় যারা হযরত ঈসার ঈশ্বরত্বের ভক্ত ছিলেন এখন তাদের গবেষকগণ নিজে নিজেই এই 'বিশ্বাস' পরিত্যাগ করা আরম্ভ করেছেন। আর যে জাতি বংশ পরম্পরায় প্রতিমা ও দেবতাদের প্রতি নিবেদিত ছিল, প্রতিমাগুলো যে প্রকৃতপক্ষেই অর্থহীন- তাদের অনেকেই একথা বুঝতে পেরেছেন। যদিও তারা এখনো আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অনবহিত বরং কয়েকটি শব্দকে কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে অবলম্বন করে রেখেছেন, তথাপি তারা যে হাজার হাজার বাজে নিয়মরীতি, বেদাত আর শিরকের শৃঙ্খল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে একত্ববাদের দ্বারের নিকটতর হয়েছেন- এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি আশা করি, অল্প কিছুকাল পরে খোদার অনুগ্রহ তাদের অনেককে তাঁর একটি বিশেষ তকদীরের হস্ত দ্বারা টেনে সত্য ও পূর্ণ তওহীদের সেই শান্তিনিবাসে প্রবিষ্ট করবে যেখানে পূর্ণ ভালোবাসা, পূর্ণ ভীতি ও পরিপূর্ণ মারেফাত প্রদান করা হয়। আমার এই প্রত্যাশা কাল্পনিক নয় বরং খোদার পবিত্র ঐশীবাণী দ্বারা এই সুসংবাদ আমি লাভ করেছি। অচিরেই ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এক জাতিতে পরিণত করতে আর সন্ধি ও শান্তির সুদিন শীঘ্র ফিরিয়ে আনতে খোদা তা'লার হিকমত কার্যকর। এসব ভিন্ন ভিন্ন জাতি একদিন যে এক জাতিতে পরিণত হবে সবাই বাতাসের এই সুগন্ধ অনুভব করছে। তদনুযায়ী, খ্রিষ্টানেরা ধারণা প্রকাশ করছেন– অচিরেই গোটা পৃথিবীর এটাই একমাত্র ধর্ম হবে, আর সবাই হযরত ঈসা (আ.)-কে ঈশ্বররূপে গ্রহণ করবে। আর ইহুদী জাতি যাদের বনী ইসরাঈলী বলা হয়- এদের এক বিশেষ মসীহ্ যিনি এদেরকে সমগ্র পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করবেন, তাঁরও এ যুগেই আসার কথা। একইভাবে ইসলামে এক মসীহ্র প্রতিশ্রুতি সংবলিত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এদের প্রতিশ্রুতির যুগও চৌদ্দ হিজরী শতাব্দীতে এসে শেষ হয়। আর সাধারণ মুসলমানদের ধারণা, জগতে ইসলামের বিস্তার লাভের যুগ সন্নিকট। সনাতন ধর্মের কতিপয় পণ্ডিতের মুখে আমি শুনেছি- তারাও এই যুগকেই তাদের এক প্রতিশ্রুত অবতারের আগমনের যুগ হিসাবে ধার্য করেন আর বলেন, ইনিই শেষ অবতার যার মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে 'ধর্ম' বিস্তৃতি লাভ করবে। আর্য সমাজীরা যদিও কোন ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাসী নন তথাপি এই প্রবহমান বাতাসের প্রভাবে তারাও এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে তাদের ধর্মমত প্রচারের সাহস এবং চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, বুদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের মাঝেও নতুন করে এই একই উদ্যম সৃষ্টি হয়েছে। আরও হাসির বিষয় হলো, এদেশের মেথর জাত অর্থাৎ ডোম সম্প্রদায়ও অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর হস্তক্ষেপ থেকে নিজেদের গোষ্ঠীকে মুক্ত রাখতে সচেষ্ট, যেন তারাও নিজেদের ধর্মমতের ন্যূনতম সংরক্ষণের একটি শক্তি অর্জন করতে পারেন। মোটকথা, এ যুগে এমন এক ধারা প্রবহমান, যার কারণে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ জাতির এবং নিজ ধর্মমতের উন্নতিকল্পে পূর্ণোদ্যমে সচেষ্ট, তারা চান, তারাই যেন সবটা ছেয়ে থাকেন– অন্যান্য জাতির নাম-গন্ধও যেন না থাকে।

সামুদ্রিক ঝড়ের সময় এক ঢেউ আরেক ঢেউয়ের উপর যেভাবে আছড়ে পড়ে, অনুরূপভাবে বিভিন্ন ধর্মমত একে অন্যের উপর আক্রমণ করে চলেছে। যাই হোক, এসব আন্দোলন দ্বারা অনুভূত হয়, এটা সেই যুগ যে যুগে আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এক জাতিতে পরিণত করার এবং সব ধর্মীয় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত একই ধর্মে সবাইকে সমবেত করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। বিবিধ আন্দোলনের এই যুগ সম্বন্ধে খোদা তা'লা কুরআন শরীফে বলেছেন,

وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿١٠٠﴾

ওয়া নুফিখা ফিস্‌সুরি ফাজামা'নাহুম জামআন' (সূরা আল-কাহফ : ১০০)।

এই আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে মিলিয়ে অর্থ হলো, যে যুগে বিশ্বের ধর্মজগতে বড় হট্টগোল দেখা দিবে আর এক ঢেউ অপর একটি ঢেউয়ের উপর যেমন আছড়ে পড়ে তেমনি এক ধর্মমত যখন অপর ধর্মমতের উপর আঘাত হানবে এবং একে অপরকে ধ্বংস করতে চাইবে, তখন আকাশ ও পৃথিবীর খোদা এই ঝড়-ঝঞ্ঝার যুগে পার্থিব উপকরণ ছাড়াই নিজ হাতে একটি নতুন জামাত সৃষ্টি করবেন। তিনি এতে এমন সব লোকদের সমবেত করবেন যারা যোগ্যতা এবং আত্মিক সামঞ্জস্য রাখেন। তখন তাঁরা ধর্মের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করবেন। তাদের মাঝে জীবন এবং প্রকৃত পুণ্যের রূহ ফুৎকার করা হবে, খোদা তা'লার মারেফাতের পানীয় তাদেরকে পান করানো হবে। আর জগতের কার্যক্রম সমাপ্ত হতেই পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তের'শ বছর পূর্বের কুরআন শরীফ কর্তৃক জগতের সম্মুখে পরিবেশিত এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ না করে।

খোদা তা'লা বিভিন্ন জাতিকে একই ধর্মে একত্রিত করার এই 'শেষ যুগ' সম্বন্ধে কেবল একটি নিদর্শন বর্ণনা করেন নি বরং কুরআন শরীফে আরও

কয়েকটি নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে। এদের একটি হলো, সে যুগে নদী কেটে অনেক খাল বের করা হবে। আরেকটি হলো, ভূপৃষ্ঠের আড়ালে লুক্কায়িত নানা প্রকারের খনি অর্থাৎ অনেক খনিজ সম্পদ আবিস্কৃত হবে এবং নানা প্রকার জাগতিক জ্ঞান প্রকাশিত হবে। অপর একটি নির্দশন হলো, এমন সব উপায়-উপকরণ সৃষ্টি হবে যেগুলোর মাধ্যমে ব্যাপক হারে বই-পুস্তক প্রকাশিত হবে (এখানে মুদ্রণ যন্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে)। আরেকটি হলো, সেই যুগে এমন একটি বাহন আবিষ্কৃত হবে যা উটকে পরিত্যক্ত করে দিবে এবং এর মাধ্যমে পরস্পর সাক্ষাতের পথ সহজ হয়ে যাবে। অপর একটি লক্ষণ হলো, পৃথিবীতে পারস্পরিক যোগাযোগ সহজ হয়ে যাবে এবং মানুষ একে অপরকে সহজেই সংবাদ প্রেরণ করতে পারবে। আরেকটি লক্ষণ হলো, সে সময়ে আকাশে একই (রমযান) মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে। অপর একটি নিদর্শন হলো, এরপর দেশে প্লেগের প্রচণ্ড মহামারি বিস্তার লাভ করবে। এত প্রচণ্ড প্লেগের মহামারি বিস্তার লাভ করবে যে, কোন শহর বা গ্রাম পেগের আক্রমণ থেকে রেহাই পাবে না, পৃথিবীতে অনেক মৃত্যু সংঘটিত হবে আর পৃথিবী নির্জন হয়ে যাবে। কিছু কিছু জনপদ একেবারেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের নামগন্ধও থাকবে না। কতিপয় লোকালয়কে কিছুটা আযাব প্রদান করে পুনরায় রক্ষা করা হবে। এই দিনগুলো হবে খোদার ভয়াবহ ক্রোধের দিন। কেননা মানুষ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আগত পুরুষের জন্য এ যুগে প্রদর্শিত নিদর্শনাবলীকে গ্রহণ করে নাই। মানুষের সংশোধনকল্পে প্রেরিত খোদার নবীকে তারা অস্বীকার করেছে আর তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছে। উল্লেখিত লক্ষণাবলী এ যুগে প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য বিষয়টি পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এমন যুগে আবির্ভূত করেছেন যখন কুরআন শরীফে লিখিত আমার আগমনের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র যুগ সংক্রান্ত লক্ষণাদি যদিও হাদীস শরীফেও বিদ্যমান কিন্তু এস্থলে আমি কেবল কুরআন শরীফ থেকেই উপস্থাপন করেছি। করআন শরীফ প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র যুগের আরেকটি লক্ষণ বর্ণনা করেছে। একস্থলে কুরআন বলে,

إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

'ইন্না ইয়াওমান ইনদা রব্বিকা কাআলফি সানাতিম্মিম্মা তাউদ্দুন' (সূরা আল্ হাজ্জ: ৪৮)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একদিন তোমাদের এক হাজার বছরের মত। যেহেতু দিন সাতটি, তাই এই আয়াতে পৃথিবীর আয়ু সাত হাজার বছর ঘোষণা করা

হয়েছে। কিন্তু এই আয়ু সেই আদমের যুগ থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে, যার বংশধর হলাম আমরা। আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী থেকে জানা যায়, এর পূর্বেও জগৎ বিদ্যমান ছিল। তারা কারা ছিল, কেমন মানুষ ছিল– একথা আমরা বলতে পারি না। হাজার বছরে পৃথিবীর একটি পর্ব পূর্ণ হয় বলে প্রতীয়মান। এ কারণেই এবং এই বিষয়টির নিদর্শনস্বরূপ পৃথিবীতে সাতটি দিন ধার্য্য করা হয়েছে, যেন প্রতিটি দিন এক হাজার বছরের প্রতীক হিসেবে সাব্যস্ত হয়। পৃথিবীতে এ ধরনের কতগুলো চক্র অতিবাহিত হয়েছে আর কত জন 'আদম' নিজ নিজ যুগে আর্বিভূত হয়েছেন– আমরা তা জানি না। যেহেতু খোদা আদি থেকেই স্রষ্টা তাই আমরা স্বীকার করি এবং বিশ্বাস রাখি, অনন্তকাল থেকে পৃথিবীর অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক সৃষ্টি নিজ নিজ সত্তায় আদিম নয়। বড়ই পরিতাপের বিষয়, খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে খোদা কেবল ছয় হাজার বছর আগে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, আকাশ এবং পৃথিবী বানিয়েছেন। এর পূর্বে খোদা চিরকাল কর্মহীন, নিষ্কর্মা, বেকার ও স্থায়ীভাবে নিষ্কর্মণ্য ছিলেন। এটা এমন বিশ্বাস যাকে কোন বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু কুরআন শরীফের শিক্ষানুযায়ী আমাদের বিশ্বাস হলো, আদি থেকেই খোদা স্রষ্টা। তিনি চাইলে কোটি কোটি বার আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্বংস করে পুনরায় বানাতে পারেন এবং তিনি আমাকে জানিয়েছেন, পূর্ববর্তী সকল সভ্যতার পর যে আদম (আ.) আগমন করেন, যিনি আমাদের সবার আদি পিতা– পৃথিবীতে তাঁর আগমনের যুগ থেকে বর্তমান মানব সভ্যতা সূচিত হয়েছে। আর এই সভ্যতার পূর্ণ চক্রের আয়ু সাত হাজার বছর পর্যন্ত প্রসারিত। এই সাত হাজার বছর আল্লাহ্‌র কাছে মানুষের সাত দিনের মত। স্মরণ রাখতে হবে, ঐশী বিধান প্রত্যেক সভ্যতার জন্য সাত হাজার বছরের চক্র ধার্য করেছে। এই চক্রের প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে মানুষের মাঝে সাতটি দিন ধার্য করা হয়েছে। মোদ্দাকথা হলো, আদম সন্তানদের সভ্যতার আয়ু সাত হাজার বছর ধার্যকৃত রয়েছে। আর নির্ধারিত এই সময়ের মধ্য থেকে আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর যুগে প্রায় পাঁচ হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছিল। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, খোদার দিনগুলোর মধ্য থেকে [তাঁর (সা.) যুগ পর্যন্ত] প্রায় পাঁচ দিন অতিবাহিত হয়েছিল। সূরাতুল আসর-এ অর্থাৎ এর বর্ণমালার গাণিতিক মানের (আবজাদের) গণনানুযায়ী কুরআন শরীফে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর যুগে যখন উক্ত সূরা অবতীর্ণ হয় তখন আদমের যুগ থেকে তত সময় অতিবাহিত হয়েছিল যা উল্লেখিত সূরার আবজাদের

সংখ্যা দ্বারা প্রতীয়মান। এই হিসাব অনুযায়ী মানবজাতির আয়ুর মধ্যে এখন **এ যুগে ছয় হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং এক হাজার বছর অবশিষ্ট আছে।** কুরআন শরীফেই নয় বরং তার পূর্বে অবতীর্ণ বেশিরভাগ গ্রন্থেই লিখিত আছে, সেই সর্বশেষ প্রেরিত পুরুষ যে আদমের রূপে আবির্ভূত হবে আর যাঁকে মসীহ্ নামে সম্বোধন করা হবে– তাঁর জন্য 'ষষ্ঠ হাজার'- এর শেষাংশে জন্ম নেয়া আবশ্যক, যেমন আদম ষষ্ঠ দিনের শেষাংশে জন্ম নিয়েছিলেন। এই সমস্ত নিদর্শন চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট।

কুরআন শরীফ এবং অন্যান্য ঐশী গ্রন্থের আলোকে উক্ত সাত হাজার বছরের বন্টন হলোঃ 'প্রথম সহস্র' পুণ্য ও হেদায়াত বিস্তারের যুগ আর দ্বিতীয় সহস্র শয়তানের আধিপত্যের যুগ। অতঃপর তৃতীয় সহস্র নেকী ও হেদায়াত প্রসারের পালা। পুনরায় চতুর্থ সহস্র শয়তানের আধিপত্যের সময়। এরপর পঞ্চম সহস্র পুণ্য এবং হেদায়াত বিস্তৃতির [এটাই সেই সহস্র যার মধ্যে আমাদের নেতা ও অভিভাবক, সর্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়স্থল হযরত মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীর সংশোধনের জন্য আবির্ভূত হন এবং শয়তানকে বন্দী করা হয়]। এবং পুনরায় ষষ্ঠ সহস্র শয়তানের মুক্তি এবং আধিপত্যের যুগ যা তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর পর থেকে আরম্ভ হয়ে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে এসে শেষ হয়। এরপর সপ্তম সহস্র– যা খোদা এবং তাঁর মসীহ্র জন্য নির্ধারিত। এটা সব ধরনের কল্যাণ, প্রাচুর্য, ঈমান, শান্তি, তাকওয়া, তওহীদ, খোদা-ভক্তি এবং সব ধরনের পুণ্য ও হেদায়েতের যুগ। বর্তমানে আমাদের অবস্থান সপ্তম সহস্রের শিরোভাগে। এরপর দ্বিতীয় কোন মসীহ্র আগমনের সুযোগ নেই। কেননা, যুগ সাতটি যা পাপ আর পুণ্যে বিভক্ত। আর সব নবী যুগের এই বিভক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। কেউ রূপকভাবে আর কেউবা বিস্তারিতভাবে। আর এই বিবরণ কুরআন শরীফে বিদ্যমান, যা দ্বারা কুরআন শরীফ থেকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। এবং এটা অদ্ভুত ব্যাপার সমস্ত নবী তাদের গ্রন্থে কোন না কোনভাবে মসীহ্র যুগের সংবাদ দিয়েছেন এবং দাজ্জালের ফেতনা সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীতে কোন ভবিষ্যদ্বাণী এই ভবিষ্যদ্বাণীর মত এমন গুরুত্ব ও ধারাবাহিকতার সাথে পাওয়া যায় না– যেভাবে সব নবী শেষ মসীহ্ সম্বন্ধে করে গেছেন। তা সত্ত্বেও এযুগে এমন মানুষও আছে যারা এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাকেও অস্বীকার করে! কেউ কেউ বলে, কুরআন শরীফ থেকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রমাণ দাও। অতীব দুঃখের বিষয়, কুরআন শরীফকে নিয়ে যদি তারা চিন্তা করতো কিংবা এ বিষয়ে মনোযোগ সহকারে ভেবে দেখতো তবে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হতো, এই ভবিষ্যদ্বাণী কুরআন শরীফে অত্যন্ত

স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। আর এত পরিষ্কারভাবে বিদ্যমান, বুদ্ধিমানের জন্য এর চেয়ে বেশি বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নেই।

সূরা তাহরীমে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এই উম্মতের কেউ কেউ ইবনে মরিয়ম নামে আখ্যায়িত হবেন। কেননা, তাঁদেরকে মরিয়ম-এর সাথে প্রথমতঃ তুলনা করার পর মরিয়মের মত তাদের মাঝে রূহ ফুৎকারের বিষয়টি বর্ননা করা হয়েছে। এতে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, প্রথমে তাঁরা মরিয়মী সত্তার অধিকারী হবে, এবং সে পর্যায় থেকে উন্নতি করে ইব্নে মরিয়মে রূপান্তরিত হবেন। তদনুযায়ী, বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে খোদা তা'লা তাঁর ওহীতে প্রথমে আমার নাম মরিয়ম রাখেন আর বলেন :

يَا مَرْيَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ

'ইয়া মারইয়ামু উস্কুন আনতা ওয়া যাওজুকাল জান্নাহ্'।

অর্থাৎ হে মরিয়ম! তুমি এবং তোমার বন্ধুরা জান্নাতে প্রবেশ কর।

তিনি পুনরায় বলেন,

يَا مَرْيَمُ نَفَخْتُ فِيْكَ مِنْ رُّوْحِ الصِّدْقِ

'ইয়া মারইয়ামু নাফাখ্তু ফীকা মিররূহিস সিদকি'।

অর্থাৎ হে মরিয়ম! আমি তোমার মধ্যে সত্যের রূহ্ ফুৎকার করেছি (যেন মরিয়ম রূপকভাবে সত্য দ্বারা গর্ভবতী হন)। আর পরিশেষে আল্লাহ্ বলেন,

يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَىَّ

'ইয়া ঈসা ইন্নি মুতওয়াফ্ফিকা ওয়া রাফিউকা ইলাইয়্যা' (সূরা আলে ইমরান: ৫৬)।

অর্থাৎ 'হে ঈসা! আমি তোমাকে মৃত্যু দান করবো এবং আমার দিকে উত্তোলন করবো। সুতরাং এস্থলে আমাকে মরিয়মী স্তর থেকে উন্নীত করে আমার নাম ঈসা রাখা হয়। আর এভাবে আমাকে ইবনে মরিয়ম আখ্যা দেয়া হয় যাতে সূরা তাহরীমে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণতা লাভ করে।

অনুরূপভাবে, সমস্ত খলীফা যে এই উম্মত থেকেই জন্ম নিবেন সূরা নূরে একথা বর্নিত হয়েছে। কুরআন শরীফ দ্বারা একথাও সাব্যস্ত হয়, এই উম্মতে ভয়ঙ্কর দু'টো যুগ আসবে। একটি সেই যুগ বা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফতের আমলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর আগমন করে। অপরটি 'দাজ্জালী ফেতনার যুগ' যা মসীহ্র আমলে আসন্ন ছিল। এর থেকে আশ্রয় চেয়ে দোয়া শেখানো হয়েছে,

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

'গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালাদ য়াল্লীন' (সূরা আল-ফাতিহা: ৭)।
(অর্থাৎ আমাদেরকে কোপগ্রস্থদের আর পথভ্রষ্টদের পথে পরিচালিত করো না।– অনুবাদক)। আর এই যুগের জন্যই ভবিষ্যদ্বাণী সূরা নূর-এ বিদ্যমান:

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا

'ওয়ালা ইউবাদ্দিলান্নাহুম মিম বা'দি খাওফিহিম আম্না' (সূরা আন-নূর: ৫৬)।
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে একত্রিত করে এই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, খোদা তা'লা বলেন, এই ধর্মের উপর শেষ যুগে বিপর্যয় নেমে আসবে আর ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এই ধর্ম লোপ পাবার আশঙ্কা দেখা দিবে। তখন খোদা তা'লা পুনরায় ধরাপৃষ্ঠে এই ধর্মকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করবেন আর ভীতিপ্রদ অবস্থার পর শান্তি প্রদান করবেন। একই ভাবে তিনি অপর এক আয়াতে বলেন,

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

'হুওয়াল্লাযি আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দিনিল হাক্কি লিইউযহিরাহু আলাদ দীনি কুল্লিহি' (সূরা আস সাফ্ফ: ১০)।
অর্থাৎ তিনিই সেই খোদা যিনি ইসলাম ধর্মকে সব ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার জন্য নিজ রসূলকে প্রেরণ করেছেন। এতেও প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র যুগের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অতঃপর–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

'ইন্না নাহনু নাযযালনায যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিযুন' (সূরা আল-হিজর: ১০)।
এই আয়াতটিও প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র যুগ নির্দেশ করছে। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র যুগ আর হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রয়েছে। চিন্তাশীল বুদ্ধিমানদের জন্য কুরআনে বর্ণিত এসব প্রমাণাদি সন্তোষজনক। আর যদি কোন অজ্ঞের নিকটে এসব প্রমাণাদি যথেষ্ট না হয়ে থাকে তাহলে তাকে স্বীকার করতে হবে, তওরাতে হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধেও কোন ভবিষ্যদ্বাণী নেই আর আমাদের নবী করীম (সা.) সম্পর্কেও কোন প্রকার অগ্রীম সুসংবাদ নেই। কেননা, সেসব কথাও কেবল রূপকভাবে বিদ্যমান– এ কারণেই ইহুদীরা হোঁচট খেয়েছে আর গ্রহণ করে নি। উদাহরণস্বরূপ, যদি পরিষ্কার অক্ষরে মহানবী (সা.) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হতো, তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁর পবিত্র নাম মুহাম্মদ (সা.) হবে, তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ্ এবং দাদার নাম আব্দুল মুত্তালিব হবে, তিনি বনী ইসমাঈল বংশের হবেন, মদীনায় হিজরত করবেন আর মূসা (আ.)-এর 'এত'

সময় পর জন্ম নিবেন– এসব নিদর্শনাবলী থাকলে কোন ইহুদী অস্বীকার করতে পারতো না। হযরত ঈসা (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে ইহুদীদের আরও বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যার কারণে তারা নিজেদেরকে সত্যিই নিরুপায় মনে করে। কেননা হযরত মসীহ্ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, মসীহ্ ততক্ষণ আবির্ভূত হবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ইলিয়াস নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন না করেন। কিন্তু ইলিয়াস নবী এখনও আসেন নি। অথচ খোদার ঐশী গ্রন্থে শর্ত উল্লেখিত ছিল, খোদার পক্ষ থেকে আগমনকারী সত্য মসীহ্র আবির্ভাবের পূর্বে ইলিয়াস নবীর দ্বিতীয়বার জগতে আগমন আবশ্যক। হযরত মসীহ্র পক্ষ থেকে এ বিষয়ে উত্তর ছিল, এই বাক্যের অর্থ ইলিয়াস-সদৃশ এক ব্যক্তি, প্রকৃত ইলিয়াস নয়। কিন্তু ইহুদীরা বলে, এটা খোদার ঐশীবাণীর 'তাহরীফ' (বিকৃতি), আমাদেরকে প্রকৃত ইলিয়াসের পুনরায় আগমনের সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এর দ্বারা জানা গেল, নবীদের বিষয়ে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী থাকে সেগুলো সবসময় সূক্ষ্ম হয়ে থাকে যেন দুর্ভাগা আর সৌভাগ্যবানদের মাঝে তফাৎটা পরিষ্কার হয়ে যায়।

এছাড়া একথাও পরিষ্কার, যে দাবি সততার ভিত্তিতে করা হয়- সেটা নিজের সাথে কেবল এক ধরনেরই প্রমাণ বহন করে না, বরং খাঁটি হীরক যেমন চতুষ্পার্শ্ব দিয়ে চক চক করে তেমনই সেই দাবিও চতুর্দিকে ঝলমল ঝলমল করে। তদনুযায়ী, আমি দাবির সাথে বলছি, 'মসীহ্ মাওউদ' হবার আমার দাবি এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ যা প্রত্যেক আঙ্গিকে জ্যোতির্ময়।

প্রথমতঃ এই দিকটি লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমার প্রত্যাদিষ্ট হবার এবং ঐশী কথোপকথন ও বাক্যালাপে ভূষিত হবার আমার দাবি প্রায় সাতাইশ বছরের। অর্থাৎ, 'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তক রচিত হবারও অনেক আগের থেকে। তারপর 'বারাহীনে আহমদীয়া' প্রকাশকালে সেই দাবি এই গ্রন্থে লিখিত আকারে প্রকাশ করা হয় যার পর প্রায় চব্বিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। তাহলে বুদ্ধিমান মাত্রই নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, মিথ্যার বেসাতি এত দীর্ঘায়িত হতে পারে না। এক ব্যক্তি যত বড় মিথ্যাবাদীই হোক না কেন, সে এমন অপকর্ম এত দীর্ঘ যুগ ধরে চালাতে পারে না যে সেই সময়কালে একটি শিশু বড় হয়ে সন্তানের পিতা হয়ে যেতে পারে। এছাড়া কোন বুদ্ধিমান একথা মানতেই পারে না, একটা মানুষ প্রায় সাতাশ বছর যাবৎ খোদা তা'লার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে আর প্রতিদিন সকালে নিজের পক্ষ থেকে ইলহাম বানিয়ে আর নিছক নিজের থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী তৈরী করে খোদা তা'লার প্রতি আরোপ করে আর প্রতিদিন দাবি করে, আজ খোদা তা'লা আমার প্রতি 'অমুক ইলহাম' করেছেন আর খোদার 'তমুক বাণী, আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

অথচ খোদা জানেন, সে ব্যক্তি এই দাবিতে মিথ্যাবাদী! তার প্রতি কখনো ইলহামও করা হয় নি, খোদা তা'লা তার সাথে কথোপকথনও করেন নি! খোদা তাকে একজন অভিশপ্ত বলে মনে করেন– এসব সত্ত্বেও তিনি তাকে সাহায্য করে যাচ্ছেন আর তার প্রতিষ্ঠিত জামাতকে উন্নতি দান করে যাচ্ছেন! তাকে সেই সব ষড়যন্ত্র আর বিপদ থেকে রক্ষা করে যাচ্ছেন যা তার শত্রুরা তার বিরুদ্ধে করে চলেছে !!

এছাড়া আরও একটি প্রমাণ আছে যার মাধ্যমে আমার সত্যতা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমার প্রত্যাদিষ্ট হবার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। সেটি হলো, যখন আমাকে কেউ চিনতো না, অর্থাৎ 'বারাহীনে আহমদীয়া'র যুগে, যখন আমি নির্জনে বসে এই পুস্তকটি রচনা করছিলাম আর অদৃশ্য-জ্ঞাতা খোদা ছাড়া অন্য কেউ আমার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিল না, সেই যুগে খোদা আমাকে সম্বোধন করে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন– সেগুলো সেই একাকিত্বের যুগে 'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকে ছেপে সারা দেশে প্রচার করা হয়। সেগুলো হলো:

يَا اَحْمَدِیُ اَنْتَ مُرَادِیُ وَ مَعِیَ۔ سِرُّكَ سِرِّیُ۔ اَنْتَ مِنِّیُ بِمَنْزِلَةِ تَوْحِیْدِیُ وَ تَفْرِیْدِیُ۔ فَحَانَ اَنْ تُعَانَ وَ تُعْرَفَ بَیْنَ النَّاسِ۔ اَنْتَ مِنِّیُ بِمَنْزِلَةٍ لَّا یَعْلَمُهَا الْخَلْقُ۔ یَنْصُرُكَ اللّٰهُ فِیُ مَوَاطِنَ۔ اَنْتَ وَجِیْهٌ فِیُ حَضْرَتِیُ اِخْتَرْتُكَ لِنَفْسِیُ۔ وَ اِنِّیُ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ یَنْصُرُكَ رِجَالٌ نُّوْحِیُ اِلَیْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ۔ یَاْتِیْكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیْقٍ۔ یَاْتُوْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیْقٍ۔ وَ لَا تُصَعِّرْ لِخَلْقِ اللّٰهِ وَلَا تَسْئَمْ مِّنَ النَّاسِ۔ وَ قُلْ رَّبِّ لَا تَذَرْنِیُ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِیْنَ۔ اَصْحَابُ الصُّفَّةِ وَ مَا اَدْرَاكَ مَا اَصْحَابُ الصُّفَّةِ۔ تَرٰی اَعْیُنَهُمْ تَفِیْضُ مِنَ الدَّمْعِ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیاً یُّنَادِیُ لِلْاِیْمَانِ۔ اِنِّیُ جَاعِلُكَ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً۔ یَقُوْلُوْنَ اَنّٰی لَكَ هٰذَا۔ قُلِ اللّٰهُ عَجِیْبٌ۔ لَا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُوْنَ۔ وَ یَقُوْلُوْنَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ۔ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیُ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ۔ هُوَ الَّذِیُ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ۔ یُرِیْدُوْنَ اَنْ یُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ۔ یَعْصِمُكَ اللّٰهُ وَ لَوْ لَمْ یَعْصِمْكَ النَّاسُ۔ اِنَّكَ بِاَعْیُنِنَا سَمَّیْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ۔ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِیَتْرُكَكَ حَتّٰی یَمِیْزَ الْخَبِیْثَ مِنَ الطَّیِّبِ۔ شَاْتَانِ تُذْبَحَانِ وَ كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ۔ وَ عَسٰی اَنْ تَكْرَهُوْا شَیْئًا وَّ هُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ وَ عَسٰی اَنْ تُحِبُّوْا شَیْئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔

উচ্চারণ: 'ইয়া আহ্‌মাদী! আনতা মুরাদী ও মা'ঈ। সির্‌রুকা সির্‌রি। আনতা মিন্নি বিমানযিলাতিন লা ইয়ালামুহাল খালকু। ইয়ানসুরুকাল্লাহু ফী মাওয়াতিনা। আনতা ওয়াজিহুন ফী হাযরাতী। ইখ্‌তার্‌তুকা লিনাফ্‌সী। ওয়াইন্নি জায়িলুকা লিন্নাসি ইমামা। ইয়ানসুরুকা রিজালুন নুহী ইলাইহিম মিনাস্‌ সামা। ইয়াতিকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমিক। ইয়াতুনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমিক। ওয়ালা তুসা'ইর লেখালকিল্লাহ্‌। ওয়ালা তাসআম মিনান্নাস। ওয়া কুল্‌ লা তাযারনি ফারদান ওয়া আনতা খাইরুল ওয়ারিসীন। আস্‌হাবুস্‌ সুফ্‌ফা ওয়া মা আদরাকা মা আস্‌হাবুস্‌ সুফ্‌ফা। তারা আয়ুনুহুম তাফীযু মিনাদ্‌ দাম্‌: রাব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদিয়ান ইউনাদি লিল ঈমান। ইন্নি জায়িলুকা ফিল্‌ আরযি খালীফাহ্‌। ইয়াকূলূনা আন্না লাকা হাযা। কুলিল্লাহু আজিব। লা ইউসআলু আম্মা ইয়াফআলু ওয়াহুম ইউসআলুন। ওয়া ইয়াকুলুনা ইন্‌ হাযা ইল্লা ইখতিলাক্‌। কুলিল্লাহ। সুম্মা যারহুম ফী খাওযিহিম ইয়ালআ'বুন। হুওয়াল্লাযি আর্‌সালা রাসুলাহু বিল্‌ হুদা ওয়া দ্বীনিল হাক্বি লিইউযহিরাহু আলাদ দ্বীনে কুল্লিহি। ইউরিদুনা আইয়ুতফিউ নূরাল্লাহে ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি ওয়ালাও কারিহাল কাফিরুন। ইয়া' সিমুকাল্লাহু ওয়ালাও লাম ইয়াসিম্‌কান নাসু। ইন্নাকা বিআইয়ুনেনা। সাম্মাইতুকাল মুতাওয়াক্কিল। ওয়ামা কানাল্লাহু লেইউতরিকাকা হাত্তা ইয়ামিযাল্‌ খাবিসা মিনাত তাইয়িব। শা'তানে তুযবাহান। ওয়া কুল্লু মান আলাইহা ফান। ওয়া আসা আন তাকরাহু শাইয়ান ওয়া হুয়া খায়রুল লাকুম। ওয়া আসা আন তুহিব্বু শাইয়ান ওয়া হুয়া শাররুল লাকুম। ওয়াল্লাহু ইয়া'লামু ওয়া আনতুম লাতা'লামুন।'

অর্থ: খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেন, হে আমার আহমদ! তুমি আমার উদ্দেশ্য। তুমি আমার সাথে আছ। তোমার রহস্য ও আমার রহস্য অভিন্ন। তুমি আমার নিকট আমার একত্ববাদ ও একেশ্বরবাদের মতই প্রিয়। তোমার সাহায্যকল্পে মানুষদের প্রস্তুত করার আর মানুষের মাঝে তোমাকে খ্যাতি প্রদান করার সময় সন্নিকট। আমার কাছে তোমার যে মান ও মর্যাদা জগৎ তা জানে না। প্রতিটি ক্ষেত্রে খোদা তোমাকে সাহায্য করবেন। তুমি আমার সন্নিধানে সম্মানিত। আমি তোমাকে নিজের জন্য মনোনীত করেছি। আমি এক বিপুল জনগোষ্ঠিকে তোমার অনুগত ও অনুসারী করবো, তুমি তাদের ইমাম হবে। আমি মানুষের অন্তরে ইলহাম করবো যেন তারা নিজ ধনসম্পদ দ্বারা তোমাকে সাহায্য করে। দূর-দূরান্তের দুর্গম পথ অতিক্রম করে তোমার কাছে আর্থিক সাহায্য আসবে। তোমার সেবার উদ্দেশ্যে লোকেরা দূর-দূরান্তের পথ পাড়ি দিয়ে আসবে। সুতরাং তুমি যেন কোনমতেই তাদের সাথে দুর্ব্যবহার না কর, আর তাদের আধিক্য, ভীড় আর দলবদ্ধ আগমনে তুমি যেন ক্লান্ত না হও। আর তুমি দোয়া কর– 'হে আমার প্রভু! আমাকে নিঃসঙ্গ রেখো না এবং তোমার চেয়ে উত্তম আর কোন উত্তরাধিকারী নেই'। খোদা তোমাকে আস্‌হাবুস্‌ সুফ্‌ফা প্রদান করবেন। আর তুমি কি জানো সেই

আসহাবুস্ সুফ্ফা কী? তুমি তাদের চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে দেখবে, আর তাঁরা বলবে, 'হে আমাদের খোদা! আমরা এক আহ্বানকারীর ডাক শুনেছি যে মানুষকে ঈমানের দিকে আহ্বান করে'। আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানাবো। মানুষ কটাক্ষ করে বলে, এই মর্যাদা তুমি কীভাবে লাভ করতে পারো? তাদের বল, সেই খোদা আশ্চর্য শক্তিসমূহের অধিকারী খোদা। তাঁর কাছে কেউ প্রশ্ন করতে পারে না– তুমি এমনটা কেন করেছো? বরং তিনি প্রত্যেকের কথায় জিজ্ঞাসা করে বলবেন– তুমি এমন কথা কেন বল্লে? তারা বলে, এ তো কেবল একটি মিথ্যা ভণিতা। এদের উত্তর দাও, খোদা স্বয়ং এই কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠাতা। এরপর তাদেরকে তাদের ক্রীড়া-কৌতুকের মাঝে মত্ত আলোয় ছেড়ে দাও। খোদা সেই সত্তা যিনি পথ-নির্দেশনা ও সত্য ধর্মসহ নিজ রসূলকে প্রেরণ করেছেন যেন সে এই ধর্মকে সমস্ত ধর্মমতের উপর বিজয়ী করে দেখায়। খোদা যে জ্যোতিকে পৃথিবীতে বিস্তৃতি দান করতে চান এরা তাকে নেভাতে চাইবে, কিন্তু খোদা সেই নূরকে পূর্ণ করবেন অর্থাৎ সব যোগ্য হৃদয়ে পৌঁছে দিবেন, কাফেররা যদি একে ঘৃণাও করে। মানুষ যদি রক্ষা না-ও করতে পারে তথাপি খোদা তোমাকে তাদের দুষ্টামি থেকে রক্ষা করবেন। তুমি আমার দৃষ্টির সম্মুখে বিদ্যমান। আমি তোমার নাম 'মুতাওয়াক্কিল' (খোদার প্রতি ভরসাকারী–অনুবাদক) রেখেছি। এবং পবিত্র ও পঙ্কিলের মাঝে ব্যবধান প্রকাশ না করা পর্যন্ত খোদা তোমাকে পরিত্যাগ করতে পারেন না। দু'টি ছাগল জবাই করা হবে। আর ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী প্রত্যেককেই শেষ পর্যন্ত মরতে হবে। তোমরা একটি বিষয়কে মন্দ মনে করতে পারো সেটা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হতে পারে এবং একটি বিষয় তোমরা মঙ্গলজনক মনে করতে পারো অথচ সেটি তোমাদের জন্য ক্ষতিকারকও হতে পারে। তোমাদের জন্য কোন্‌টা উত্তম সেটা খোদা তা'লা জানেন, তোমরা জানো না'।

জানা উচিত, এই ইলহামগুলোতে চারটি মহান ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ বিদ্যমান। (১) একটি হলো, এমন যুগে যখন আমি একা ছিলাম, কেউ আমার সাথে ছিল না, যার পর এখন প্রায় তেইশ বছর অতিবাহিত হয়েছে, সেই যুগে খোদা তা'লা আমাকে সুসংবাদ দেন, তুমি একলা থাকবে না, সে সময় আসন্ন বরং সন্নিকট যখন তোমার সাথে দলে দলে লোক এসে যোগ দেবে। এবং তারা দূর-দুরান্তের পথ পাড়ি দিয়ে তোমার কাছে আসবে। তারা এত অধিক সংখ্যায় আসবে, তাদের কারণে তুমি সম্ভবতঃ ক্লান্ত হয়ে পড়বে আর তাদের সাথে দুর্ব্যবহারের উপক্রম হবে। কিন্তু তুমি এমনটি করো না। (২) দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটি হলো, এদের পক্ষ থেকে অনেক আর্থিক সহযোগিতা পাওয়া যাবে। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে একটি গোটা জগৎ সাক্ষী। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো 'বারাহীনে আহমদীয়া' ছাপানোর সময়ে আমি কাদিয়ানের নির্জন গ্রামে নিঃসঙ্গ ও

লোকচক্ষুর আড়ালে একাকী পড়েছিলাম। কিন্তু এরপরে দশ বছর অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই খোদা তা'লার ইলহাম অনুযায়ী মানুষের সমাগম আরম্ভ হয়ে গেল এবং নিজ সম্পদ দ্বারা লোকেরা সাহায্য করাও আরম্ভ করে দিল। এমনকি দুই লাখের অধিক লোক বর্তমানে আমার দীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত। (৩) ইলহামসমূহের মধ্যে তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটি হলো, মানুষ এই জামাতকে নির্মূল করতে এবং এই 'নূর'-কে নিভিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু তারা তাদের এই চেষ্টায় ব্যর্থ হবে। যদি কেউ স্পষ্ট বেঈমানীর পথ অবলম্বন করতে চায় তবে তাকে বাঁধা দেয়ার কেউ নেই। তা না হলে, এই তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী সূর্যের ন্যায় জাজ্বল্যমান। এ কথা স্পষ্ট এক ব্যক্তি একা নিঃসঙ্গ ও অসহায় অবস্থায় যখন তাঁর লক্ষ লক্ষ মানুষের নেতা হবার কোন লক্ষণ নেই কিংবা লোকদের পক্ষ থেকে তাঁর সেবায় হাজার হাজার টাকা পরিবেশনের কোন সম্ভাবনা নেই এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির এমন উন্নতি ও এশী সাহায্য লাভের এমন মহান ভবিষ্যদ্বাণী কেবল যদি বুদ্ধি এবং অনুমানের ভিত্তিতে করা সম্ভব হয় তবে অস্বীকারকারীর উচিত এমন ব্যক্তির নাম নিয়ে উদাহরণ উপস্থাপন করা। বিশেষ করে, যখন পূর্ববর্তী দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে তৃতীয়টিকে মিলিয়ে প্রত্যক্ষ করা হয়। এর অর্থ দাঁড়ায় মানুষ অনেক চেষ্টা করবে যেন এসব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হয় কিন্তু খোদা তা'লা পূর্ণ করবেন। এই তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী একীভূত দৃষ্টিতে দেখলে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এটা মানুষের কাজ নয়। মানুষ তো এটাও দাবি করতে পারে না সে 'অমুক সময়' পর্যন্ত জীবিত থাকবে। (৪) এরপর উক্ত ইলহাম সমূহে চতুর্থ ভবিষ্যদ্বাণী হলো, এ সময়ে এই জামা'তের দু'জন অনুসারীকে শহীদ করা হবে। তদনুযায়ী, শেখ আব্দুর রহমান কাবুলের শাসক আমীর আব্দুর রহমানের নির্দেশে এবং মৌলভী সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ খান সাহেবকে আমীর হাবীবুল্লাহ্ কর্তৃক কাবুলে শহীদ করা হয়।

এছাড়া আরও শত শত এমন ভবিষ্যদ্বাণী আছে যেগুলো নির্ধারিত সময়ে পূর্ণ হয়েছে। একবার মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবকে অগ্রিম সংবাদ প্রদান করা হয়, তাঁর ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম নিবে এবং এর গায়ে কয়েকটি ফোঁড়াও থাকবে। বাস্তবে এমনই হলো। তাঁর এক পুত্র সন্তান হলো যার গায়ে কয়েকটি ফোঁড়াও ছিল। উক্ত মৌলভী সাহেব এই সমাবেশে উপস্থিত। তাঁকে যে কেউ আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করতে পারে। একবার 'মালির কোটলা'র জমিদার সরদার মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের ছেলে আব্দুর রহীম অসুস্থ হয়ে পড়ে আর নৈরাশ্যজনক অবস্থা দেখা দেয়। আমাকে ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা সংবাদ দিলেন, তোমার সুপারিশে এই ছেলে আরোগ্য লাভ করতে পারে। তদানুযায়ী, এক স্নেহশীল শুভাকাঙ্খীরূপে আমি তার জন্য অনেক দোয়া করি, আর সেই ছেলে ভালো হয়ে যায়। এ যেন এক মৃত ব্যক্তির জীবন লাভ! ঠিক তেমনি তাঁর দ্বিতীয় ছেলে আব্দুল্লাহ্ খানের অসুখ হয়। সেও মারাত্মক ব্যধিতে

আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে পড়ে। তার আরোগ্যের বিষয়েও আমাকে সংবাদ দেয়া হয়, আর সে-ও আমার দোয়ায় সেরে ওঠে।

একইভাবে আরও অনেক নিদর্শন আছে। যদি এদের সবক'টা লেখা হয় তবে দশ দিনেও এ প্রবন্ধ শেষ হবে না। এসব নিদর্শনের সাক্ষী কেবল দু'একজন নন বরং কয়েক লক্ষ মানুষ এগুলোর সাক্ষী। অর্থাৎ সেই নিদর্শনসমূহ থেকে দেড়শ' নিদর্শন আমি আমার 'নুযূলুল মসীহ্' নামক বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছি যা অচিরেই প্রকাশিত হবে। এসব নিদর্শন কয়েক প্রকার। কয়েকটি আকাশে প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি ধরাপৃষ্ঠে। কয়েকটি বন্ধুবর্গের বিষয়ে আবার কতিপয় শত্রুদের বিষয়ে পূর্ণ হয়েছে। কিছু সংখ্যক আমার নিজের বিষয়ে, কিছু সংখ্যক আমার সন্তানদের সম্বন্ধে, আবার কিছু এমন নিদর্শনও রয়েছে যা আমার সাথে কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই শত্রুর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। যেমন কসূর নিবাসী মৌলভী গোলাম দস্তগীর 'ফতেহ রহমান' নামক তার বইয়ে নিজে থেকেই আমার সাথে মোবাহালা করেন আর দোয়া করেন, দু'জনের মাঝে যে মিথ্যাবাদী তাকে যেন খোদা ধ্বংস করে দেন। তদনুযায়ী, এই দোয়ার পর মাত্র কয়েকদিন অতিবাহিত হতে না হতেই উক্ত মৌলভী সাহেব নিজেই মৃত্যুবরণ করে আমার সত্যতার সাক্ষী দিয়ে গেলেন। এছাড়া হাজার হাজার মানুষের কাছে খোদা তা'লা আমার সত্যতা কেবল স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। মোটকথা, এসব নিদর্শন এত প্রকাশ্য যে, এদের সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখলে মানুষের জন্য স্বীকার করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে না।

এ যুগের কোন কোন বিরোধী একথাও বলেন, যদি কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণ পাই তবে আমরা মেনে নিব। আমি প্রত্যুত্তরে তাদেরকে বলছি, কুরআন শরীফে আমার মসীহ্ হবার বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। আমি এ বিষয়ে কিছুটা ইতোমধ্যে লিখেছি। তাছাড়া, এই শর্ত আরোপ করাটাও একটা প্রকাশ্য বাড়াবাড়ি ও অন্যায় দাপট। একজন ব্যক্তিকে সত্যবাদীরূপে গ্রহণ করার জন্য তাঁর আগমনের প্রকাশ্য সংবাদ কোন ঐশী গ্রন্থে বিদ্যমান থাকাটাও আবশ্যক নয়। যদি এটা আবশ্যক শর্ত হয় তাহলে একজন নবীরও নবুওত সাব্যস্ত হবে না। প্রকৃত সত্য হলো, এক ব্যক্তির নবুওতের দাবির বিষয়ে সর্বপ্রথম যুগের চাহিদা লক্ষ্য করা হয়। এরপর সে নবীদের নির্ধারিত যুগে এসেছে কিনা যাচাই করতে হয়। আবার, খোদা তা'লা তাকে সমর্থন করেছেন কিনা এটাও চিন্তা করে দেখতে হয়। এছাড়া এটাও লক্ষণীয়, শত্রুদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত সমস্ত আপত্তি-অভিযোগের পূর্ণ ও সমীচীন জবাব দেয়া হয়েছে কি না! এসব বিষয় যদি সাব্যস্ত হয় তবেই সে ব্যক্তিকে সত্য বলে মান্য করা হবে, তা নইলে নয়।

এটা অতীব স্পষ্ট, বর্তমান যুগ নিজ অবস্থা দ্বারা আকুতি জানাচ্ছে– এ সময় ইসলামের অভ্যন্তরীণ দলাদলি দূরীভূত করার লক্ষ্যে, বহিরাক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য আর বিলুপ্ত আধ্যাত্মিকতাকে জগতে পুনরায় প্রতিষ্ঠাকল্পে নিঃসন্দেহে একজন ঐশী সংস্কারকের প্রয়োজন, যিনি পুনরায় পূর্ণ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করে ঈমানকে সতেজ করবেন। এ প্রক্রিয়ায় তিনি মানুষকে মন্দকর্ম ও পাপ থেকে মুক্ত করে পুণ্য ও সততার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। সুতরাং ঠিক প্রয়োজনের সময় আমার আগমন এত স্পষ্ট একটি বিষয় যে, ঘোর বিরোধী ছাড়া অন্য কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে বলে আমার মনে হয় না। দ্বিতীয় শর্ত, অর্থাৎ নবীদের ধার্যকৃত সময়ে তাঁর আগমন ঘটেছে কি না। এ শর্তটিও আমার ক্ষেত্রে পূর্ণ হয়েছে। কেননা, নবীগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যখন ষষ্ঠ সহস্র শেষ হবার উপক্রম হবে তখন প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আবির্ভাব ঘটবে। চন্দ্র হিসাবে হযরত আদমের যুগ থেকে গণনা করলে ষষ্ঠ সহস্র এক যুগ পূর্বেই সমাপ্ত হয়েছে আর সৌর হিসাবে যষ্ঠ সহস্র প্রায় শেষ হবার পথে। এছাড়া আমাদের নবী (সা.) বলেছিলেন, প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে একজন মোজাদ্দেদ (সংস্কারক) আগমন করবেন যিনি ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন। বর্তমানে চর্তুদশ শতাব্দীর একুশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে আর এখন বাইশ বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে। সেই মোজাদ্দেদ যে, ইতোমধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন এটা কি একথার যথেষ্ট প্রমাণ নয়? তৃতীয় শর্ত ছিল, খোদা তা'লা দাবিকারকের সমর্থন করেছেন কি না! তদনুযায়ী, এই শর্তও আমার সত্তায় স্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছে। কেননা, এদেশে বিদ্যমান প্রত্যেক ধর্মগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত কোন কোন শত্রু সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আমাকে নির্মূল করতে চেয়েছে আর এ লক্ষ্যে অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা তাদের সকল অপচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে। কোন ধর্মগোষ্ঠি এখন একথা গর্ব করে বলতে পারবে না, তাদের কেউ এই ব্যক্তিকে ধ্বংস করার কোনরূপ প্রচেষ্টা চালায় নি। তাদের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খোদা তা'লা আমাকে সম্মান প্রদান করেছেন আর হাজার হাজার মানুষকে আমার অনুগত করে দিয়েছেন। এটা খোদার সমর্থন নয়তো কি? একথা কে না জানে, প্রত্যেক ধর্মগোষ্ঠী নিজ নিজ পন্থায় আমাকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু তাদের এই অপচেষ্টায় আমি ধ্বংস হই নি বরং দিন দিন উন্নতি লাভ করেছি, এমনকি এখন আমার জামা'তের লোকসংখ্যা দু'লক্ষেরও অধিক হয়ে গেছে। সুতরাং খোদা তা'লার গোপন হস্ত যদি আমার সমর্থনে কার্যকর না হতো, যদি আমার এই কার্যক্রম কেবল এক মানবীয় পরিকল্পনা হতো, তাহলে আমি আমার বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত এসব নানাবিধ তিরের কোন না কোনটার লক্ষ্যস্থলে অবশ্যই পরিণত হয়ে কবেই ধ্বংস হয়ে যেতাম আর আজ আমার কবরের চিহ্নও অবশিষ্ট থাকতো না। কেননা, যে খোদার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে তাকে মারবার অনেক সুযোগ

বেরিয়ে আসে। কারণ, স্বয়ং খোদা তা'লা তার শত্রু হয়ে যান। কিন্তু খোদা তা'লা চব্বিশ বছর আগে তাঁর প্রদত্ত সেই সংবাদ অনুযায়ী আমাকে এদের সকল ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এছাড়া এটা কত স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ঐশী সমর্থন 'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকে আমার নিঃসঙ্গতা আর একাকীত্বের যুগে খোদা তা'লা আমাকে স্পষ্ট ভাষায় সুসংবাদ দিয়েছিলেন, 'আমি তোমাকে সাহায্য করবো, একটি বৃহৎ দলকে তোমার অনুসারী করে দিব আর বিরুদ্ধবাদীদের ব্যর্থ করবো'। তাই একটু পরিষ্কার হৃদয়ে চিন্তা করে দ্যাখো, এটা কত স্পষ্ট ঐশী সমর্থন আর কত প্রকাশ্য একটি নিদর্শন! আকাশের নীচে এমন শক্তি কি কোন মানুষের বা শয়তানের আছে, একাকীত্বের যুগে এমন একটি সুসংবাদ দেয় আর তা পূর্ণতাও লাভ করে? আর হাজার হাজার শত্রু মাথাচাড়া দেয় ঠিকই কিন্তু কেউ এই শুভসংবাদের পূর্ণতাকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে না!

এরপর চতুর্থ শর্ত ছিল– বিরোধীরা যে সব অভিযোগ উত্থাপন করেছে সেগুলোর পূর্ণ ও সমীচীন সদুত্তর দেয়া হয়েছে কিনা? এই শর্তটিও পরিষ্কারভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। কেননা, বিরুদ্ধবাদীদের একটা বড় আপত্তি ছিল, প্রতিশ্রুত মসীহ্ হলেন স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.)। তিনিই দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করবেন। তাদের উত্তর দেয়া হয়েছে, কুরআন শরীফ দ্বারা সাব্যস্ত, হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন, এরপর তিনি পুনরায় পৃথিবীতে কখনই আসবেন না। যেমন, খোদা তা'লা তাঁর (ঈসার) নিজের মুখেই এই ঘোষণা করেছেন:

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ

'ফালাম্মা তাওয়াফফাইতানী কুনতা আনতার রাক্বীবা আলাইহিম' (সূরা আল-মায়েদা: ১১৮)।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে মিলিয়ে এর অর্থ হলো, খোদা তা'লা কিয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আ.)-কে প্রশ্ন করবেন, তুমি কি এ শিক্ষা দিয়েছিলে, আমাকে এবং আমার মাতাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর এবং আমাদের উপাসনা কর? তিনি উত্তর দিবেন, 'হে আমার খোদা! আমি যদি এমন কথা বলে থাকি তবে তুমিতো তা জানবেই কারণ, তুমি অদৃশ্য জ্ঞাতা। আমি তাদেরকে কেবল সে কথাই বলেছি যা তুমি আমাকে আদেশ করেছিলে, অর্থাৎ খোদাকে এক অদ্বিতীয় সমকক্ষহীন আর আমাকে তাঁর রসূল বলে মান্য কর। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের অবস্থা অবগত ছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে ছিলাম। তারপর তুমি যখন আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমি তাদের বিষয়ে সাক্ষী। আমার পর তারা কি করেছে-আমি তা কীভাবে জানবো?

এখন, এই আয়াতসমূহ দ্বারা একথা স্পষ্ট, হযরত ঈসা (আ.) উত্তর দিবেন: যতক্ষণ আমি জীবিত ছিলাম, খ্রিষ্টানরা বিপথগামী হয় নি আর যখন আমি

মৃত্যুবরণ করলাম তখন তাদের অবস্থা কি হয়েছে আমি তা জানি না। তাই, একথা যদি স্বীকার করে নেয়া হয় যে, হযরত ঈসা (আ.) এখনও জীবিত, তাহলে একই সাথে খ্রিষ্টানেরা যে এখনও পথভ্রষ্ট হয় নি আর সঠিক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত একথাও মানতে হবে। তাছাড়া, এই আয়াতে নিজ মৃত্যুর পর হযরত ঈসা (আ.) নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছেন, হে আমার খোদা! যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দান করলে তখন থেকে আমি নিজ জাতির অবস্থা জানি না। সুতরাং একথা যদি সত্য বলে মেনে নেয়া হয় যে, তিনি (আ.) কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে আগমন করবেন আর মাহদীর সাথে একত্রে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন তাহলে নাউযুবিল্লাহ্ কুরআন শরীফের এই আয়াত ভুল সাব্যস্ত হয়। কিংবা একথা স্বীকার করতে হবে, হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'লার সাথে মিথ্যা বলবেন! আর তিনি যে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন, চল্লিশ বছর অবস্থান করেছেন আর মাহ্দীর সাথে একত্রে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন– এসব কথা গোপন করবেন! সুতরাং যদি কুরআন শরীফে বিশ্বাস রাখো তবে কেবলমাত্র এই একটি আয়াত দ্বারাই সেই সব জল্পনা-কল্পনা মিথ্যা সাব্যস্ত হয় যাতে বলা হয়েছে, একজন খুনী মাহ্দী জন্ম নিবেন আর ঈসা (আ.) তার সাহায্যকল্পে আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন বিশ্বাস পোষণ করে সে নিঃসন্দেহে কুরআনকে পরিত্যাগ করে।

যখন আমাদের বিরোধীরা সকল বিষয়ে পরাভূত হয় তখন বলে, কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি। যেমন, আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী। আমি জিজ্ঞেস করি, আথম এখন কোথায়? উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর মূলকথা ছিল, যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী সে সত্যবাদীর জীবদ্দশায়ই মৃত্যুবরণ করবে। তাই, আথম মৃত্যুবরণ করেছে। আর আমি এখনও জীবিত আছি। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি শর্তসাপেক্ষ ছিল অর্থাৎ এতে উল্লেখিত সময়সীমা শর্তযুক্ত ছিল। যখন ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করে আথম ভীত হলো, তখন সে শর্তপূর্ণ করেছিল। তাই তাকে বাড়তি কয়েক মাসের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। পরিতাপের বিষয়, এ ধরনের আপত্তি উত্থাপনকারীরা চিন্তা করে দেখে না যে, ইউনুস নবীর পুস্তকে যেভাবে লেখা আছে, ইউনুস নবী কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে কোনরূপ শর্ত যুক্ত ছিল না। তা সত্ত্বেও ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হয় নি। প্রকৃতকথা হলো, সতর্কবাণী (ওয়াঈদ) অর্থাৎ এমন ভবিষ্যদ্বাণী যার মাঝে কারও প্রতি শাস্তি বর্ষণের প্রতিশ্রুতি থাকে– এটা চিরকাল খোদার নিকট তওবা বা সদকা খয়রাত অথবা খোদাভীতির শর্তে শর্তযুক্ত হয়ে থাকে। তওবা, ইস্তেগফার, সদকা-খয়রাত আর খোদাভীতির কারণে এসব ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় বিলম্ব হতে পারে কিংবা

একেবারেই রহিত হতে পারে। তা নাহলে ইউনুস নবী নবীই সাব্যস্ত হতে পারেন না। কেননা তার সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ভ্রান্ত সাব্যস্ত হয়েছে। অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার বিষয়ে খোদার ইচ্ছা- এটা সদকা, খয়রাত আর দোয়া দ্বারাও দূরীভূত হতে পারে আবার খোদাভীতির মাধ্যমেও পরিবর্তিত হতে পারে। সুতরাং ঐশী শাস্তি সংবলিত ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য কেবল এটুকু, আল্লাহ তা'লা এক ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করেন যা তিনি তাঁর কোন নবীর নিকট প্রকাশ করেছেন। এই ইচ্ছা কোন নবীর কাছে ব্যক্ত না করার ক্ষেত্রে সদকা-খয়রাত আর দোয়া দ্বারা যদি সেটা দূরীভূত হতে পারে, তাহলে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কেন সেটা দূরীভূত হতে পারবে না? এ ধরনের চিন্তা স্পষ্ট অজ্ঞতার পরিচায়ক আর এতে সব নবীর বিরোধিতা হয়। তাছাড়া, কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ করতে গিয়ে নবীর সিদ্ধান্ত নির্ণয় প্রচেষ্টা (ইজতেহাদ) ভুলও হতে পারে– এতে কোন ক্ষতি নেই। মানবীয় বৈশিষ্ট্য নবীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। হযরত ঈসা (আ.) বলেছিলেন, আমার বারজন হাওয়ারী স্বর্গে বারটি সিংহাসনে বসবেন। কিন্তু একথা সত্য প্রতীয়মান হয় নি। বরং একজন হাওয়ারী মুরতাদ হয়ে জাহান্নামের যোগ্য হয়েছে। তিনি (আ.) বলেছিলেন, এ যুগের মানুষ জীবিত থাকতে থাকতেই আমি পুনরায় আগমন করবো। এ কথাও সত্য সাবস্ত হয় নি। এছাড়া হযরত ঈসা (আ.) এর আরও কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী ইজতেহাদী ত্রুটিবশতঃ পূর্ণ হতে পারে নি। মোটকথা, এসবই ছিল ইজতেহাদী ভুল। আর আমার ভবিষ্যদ্বাণীর অবস্থা হলো, যদি কেউ ধৈর্য ও সততার সঙ্গে শুনতে রাজী থাকে তাহলে এক লক্ষের চেয়েও বেশি ভবিষ্যদ্বাণী আর নিদর্শন আমার সমর্থনে প্রকাশ করা হয়েছে। তাই হাজার হাজার পূর্ণতাপ্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী থেকে শিক্ষা লাভ না করে (তাদের দৃষ্টিতে) একটি অবোধগম্য ভবিষ্যদ্বাণীকে আপত্তির লক্ষ্যস্থল বানিয়ে হট্টগোল বাঁধানো আর এর দ্বারাই সিদ্ধান্ত প্রদান করা নিতান্তই অবিচার।

আমি আশা করি এবং পূর্ণ বিশ্বাস রাখি, কোন ব্যক্তি যদি আমার কাছে এসে চল্লিশ দিনও অবস্থান করে তাহলে সে একটা না একটা নিদর্শন প্রত্যক্ষ করবেই। আমি এখানেই বক্তব্য শেষ করছি আর আমি বিশ্বাস রাখি একটুই সত্যান্বেষীর জন্য যথেষ্ট।

ওয়াসসালামু আলা মানিত্তাবায়াল হুদা
লেখক: মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

দ্রষ্টব্য

আমার কাছে ২ সেপ্টেম্বর, ১৯০২ হেকীম মির্যা মাহমুদ ইরানী নামক এক ব্যক্তি পত্রের মাধ্যমে

وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ

[ওয়াজাদাহা তাগরুবু ফি আইনিন হামিআতিন] (সূরা আল-কাহ্‌ফ: ৮৭)

আয়াতের অর্থ জানতে চেয়েছেন। অতএব একথা মনে রাখতে হবে, এই কুরআনী আয়াতে অনেক গভীর রহস্য অন্তর্নিহিত যা আয়ত্ত করা সাধ্যাতীত। তথাপি খোদা তা'লা আমার কাছে এর যে অর্থ প্রকাশ করেছেন তা হলো: এই আয়াতটি পূর্বাপরের সাথে মিলিত আকারে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র বিষয়ে একটি ভবিষ্যদ্বাণী এবং এটি তাঁর আবির্ভাবের যুগ নির্ধারণ করে। এর ব্যাখ্যা হলো, প্রতিশ্রুত মসীহ্ নিজেও একজন 'যুলকারনাইন'। কেননা আরবীতে শতাব্দীকে 'কারণ' বলে। কুরআনের আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ যিনি অনাগত একযুগে আবির্ভূত হবেন তাঁর জন্ম আর তাঁর আবির্ভাব দু'টি শতাব্দীর সমন্বয়ে সংঘটিত হবে। আর বাস্তবে আমার সত্তা ঠিক এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। আমার সত্তা সকল প্রচলিত ও পরিচিত শতাব্দী– তা সে হিজরী শতাব্দীই হোক বা খ্রিষ্টীয় শতাব্দী হোক কিংবা বিক্রমাব্দিই হোক– সর্বক্ষেত্রে আমার সত্তা দু'টি শতাব্দীতে বিস্তৃত। কোন একটি শতাব্দীতে আমার জন্ম ও আবির্ভাব সীমাবদ্ধ নয়। তাই, আমার জ্ঞানানুযায়ী, আমার জন্ম ও আবির্ভাব প্রত্যেক ধর্মমতের শতাব্দীতে সম্প্রসারিত। সুতরাং এই অর্থে আমি 'যুলকারনাইন'। অনুরূপভাবে, কিছু হাদিসেও মসীহ্ মাওউদের নাম 'যুলকারনাইন' বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদিসে সেই অর্থেই 'যুলকারনাইন' ব্যবহৃত হয়েছে যা আমি ব্যক্ত করেছি। ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে অবশিষ্ট আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়: পৃথিবীর দু'টি বৃহৎ জাতিকে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। মসীহ্‌র আহ্বান লাভের ক্ষেত্রেও তাদের অধিকার অগ্রগণ্য। তদনুযায়ী এস্থলে খোদা তা'লা রূপক অর্থে বলছেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ নিজ যাত্রাপথে দু'টি জাতির সাক্ষাৎ পাবেন। একটি জাতিকে তিনি অন্ধকারে এমন এক জলাশয়ের ধারে বসা অবস্থায় দেখবেন যার পানি

পান করার অযোগ্য আর এতে দুর্গন্ধ আর ময়লা এত বেশি, এখন আর একে পানি বলা চলে না। এরা হলো খ্রিষ্টান জাতি, যারা অন্ধকারে নিমজ্জিত, যারা নিজেদের ভুলে মসীহি জলাশয়কে দুর্গন্ধময় কাদার সাথে মিশ্রিত করে ফেলেছে। দ্বিতীয় যাত্রায়, 'যুলকারনাইন' মসীহ্ মাওউদ এমন লোকদের দেখতে পান যারা প্রখর রোদে বসে আছে। সেই রোদ আর এদের মাঝে কোন আড়াল নেই। এরা সূর্য থেকে আলো গ্রহণ না করে কেবল সূর্যতাপে শরীর ঝলসানো এদের ভাগ্যে জুটেছে আর তাদের চামড়ার উপরিভাগ পুড়ে কালো হয়ে গেছে। এদের দ্বারা মুসলমান জাতিকে বুঝানা হয়েছে, যারা সূর্যের সামনে বসে আছে ঠিকই কিন্তু রোদে পোড়া ছাড়া আর কিছুই এদের লাভ হয় নি। অর্থাৎ এদের তওহীদের সূর্য প্রদান করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু নিজেদের শরীর ঝলসানো ছাড়া প্রকৃত কোন আলো এরা গ্রহণ করে নি। অর্থাৎ ধর্মানুরাগের খাঁটি সৌন্দর্য আর প্রকৃত চরিত্র এরা হারিয়ে ফেলেছে আর বিদ্বেষ, হিংসা, উগ্রতা আর পশুসুলভ আচরণ এদের ভাগ্যে জুটেছে।

বক্তব্যের সারাংশ হলো, আল্লাহ তা'লা এই আঙ্গিকে বলছেন, যুলকারনাইন মসীহ্ মাওউদ এমন যুগে আগমন করবেন যখন খ্রিষ্টানরা অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে আর তাদের কাছে কেবল দুর্গন্ধময় কাদা থাকবে, আরবীতে যাকে 'হামাউন' বলে। আর মুসলমানদের কাছে শুষ্ক একত্ববাদ (তওহীদ) থাকবে, আর তারা বিদ্বেষ আর পশুসুলভ হিংস্রতায় দ্বন্ধ হবে। এরপর মসীহ্ মাওউদ অর্থাৎ 'যুলকারনাইন' তৃতীয় এক জাতির সাক্ষাৎ পাবেন যারা ইয়া'জূজ মা'জূজের কারণে অতিষ্ঠ। এরা বড়ই ধর্মপরায়ণ আর বিশুদ্ধচিত্তের অধিকারী হবেন। এরা যুলকারনাইন মসীহ্ মাওউদের কাছে ইয়া'জূজ মা'জূজের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য সাহায্য চাইবেন আর তিনি এদের জন্য এক আলোকিত 'বাঁধ' নির্মাণ করবেন অর্থাৎ ইসলামের স্বপক্ষে এমন সব শক্তিশালী যুক্তি এঁদের শিক্ষা দিবেন যা নিশ্চিতভাবে ইয়া'জূজ মা'জূজের আক্রমণকে বন্ধ করবে। তিনি এঁদের অশ্রুজল মুছে দিবেন আর এদের সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং এদের সঙ্গ দিবেন। এতে সেই সব লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যারা আমাকে মান্য করেন। এটা একটা মহান ভবিষ্যদ্বাণী। এতে আমার আবির্ভাব, আমার যুগ আর আমার জামা'তের স্পষ্টভাবে সংবাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এসব ভবিষ্যদ্বাণী যে মনোযোগ সহকারে পাঠ করে সে বরকতমণ্ডিত।

কুরআন শরীফের একটি রীতি হলো, এটি এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীও উপস্থাপন করে, যার মাঝে উল্লেখ করা হয় একজনের কথা অথচ এর মাধ্যমে অনাগত যুগের একটি ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করা প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, সূরা ইউসুফেও এই একই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। অর্থাৎ বাহ্যত: যদিও একটি ঘটনাই বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু এর মাঝে ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত, যেভাবে ইউসুফের (আ.) ভাইয়েরা প্রথমত, তাঁকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই ইউসুফই তাদের নেতা নির্ধারিত হয়েছিলেন। এস্থলে কুরাইশদের ক্ষেত্রেও এমনই হবে। তদনুযায়ী, এরাও মহানবী (সা.) কে প্রত্যাখ্যান করে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে কিন্তু পরিণামে সেই প্রত্যাখ্যাত মানুষই তাদের পথ-প্রদর্শক ও নেতা নিযুক্ত হন। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, এভাবে মসীহ্ মাওউদ অর্থাৎ এই অধম সম্বন্ধে কুরআন শরীফে বার বার ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও আত্মিক দৃষ্টিশক্তিহীন কিছু মানুষ বলে কুরআন শরীফে মসীহ্ মাওউদের কোন উল্লেখ নেই। এরা সেই খ্রিষ্টানদের মত যারা এখনও বলে রসূলুল্লাহ (সা.) সম্বন্ধে বাইবেলে কোন ভবিষ্যদ্বাণী নেই!!

چشم باز و گوش باز و ایں ذکا خیرہ ام از چشم بندئ خدا
ایں گماں از تیر ہا پُر ساختہ صید نزدیک است دور انداختہ

'মানুষের চোখ খোলা, কান উন্মুক্ত আর
তার বোধশক্তিও কার্যকর কিন্তু খোদার চোখ বন্ধ–
আমি এই কথায় আশ্চর্য ও হতবাক!
এই ধারণাটি শিকার নাগালের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও
ধনুকে প্রস্তুত তিরকে দূরে নিক্ষেপ করার মত বোকামি!'
(ফার্সী পংক্তির অনুবাদ)

লেখক:

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

Lecture Lahore

Islam aur is Mulk ke dusrey Mazahab

[Islam and Other Religions in this Country]

This is an address delivered by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad[as] on 3rd December 1904 at Lahore. It is also known as Lecture Lahore, i.e. an Address that was delivered in Lahore.

Here Hazrat Mirza Ghulam Ahmad[as] compares the teachings of Islam with those of Hinduism and Christianity and proves with very convincing proofs that Islam is the best religion and it is this religion that the people should adopt.

The theme on which he dilates is that the prevailing condition of sinfulness in the world is the outcome of lack of God-realisation. The more a man realises the powers of God, the more he is prone towards virtuous deeds. The farther away he goes from God, the greater is his indulgence in sinful life.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad[as] says that the atonement taught by Christianity cannot cure this malady nor can it be set right by the teachings of Vedas. A perfect God-realisation is possible only through revelation and it is only Islam which can help create conditions conducive to the revelations from God. The Hindus and the Christians do not believe that God speaks any more.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad[as] elaborates that there are two parts of religion:

1. Beliefs (tenets) and
2. Practices.

The very basic of our belief is in the existence of God and in His attributes. He dilates on this point and proves to his audience that Trinity taught by Christianity and the concept of ever-living, ever-lasting of matter and soul taught by the Vedas can never be true.

Talking about the practices or deeds, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad[as] says that there are three stages of our duties towards human beings according to the teachings of Islam and here he refers to the verse Innallaha ya'murubil adli wal Ihsani wa eeta'izil Qurba (Sura Al-Nahl : 91).

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad[as] also compares the teachings of Islam and other religions in connection with forgiveness and vengeance.

Before closing the book, he mentions his claim to be the Promised Messiah and cites proofs of the truthfulness of his claim and he also mentions his prophecies that had come to pass till that time. He touches upon the subject of zul Qarnain mentioned in the Holy Quran and gives a mataphoric explanation of the events.

© Islam International Publications Ltd.

ISBN 9 789849 91039-8

9 789849 910398